কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন সুজিত কুণ্ডু

এডিট করেছেন অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোন পুরনো পত্রিকার কোন সংখ্যা থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের এই অভিযানে সঙ্গী হতে চান তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

জুলেভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সীঃ লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

দীর্ঘ দিন ক্যাপ্টেন নিমোর আর দেখা মিলল না। ২৭শে ডিসেম্বর তিনি এসে উপস্থিত হলেন অ্যারোনেক্সের কাছে। মানচিত্রের এক জায়গায় আঙুল রেখে বললেন—

আমরা এখন ভ্যানিকোরো-র কাছে পৌঁছেছি।

আমি কি এই বিখ্যাত দ্বীপটি দেখতে পাব?

হ্যাঁ, পাবেন প্ল্যাটফর্মে চলুন।

প্ল্যাটফর্মের উপর উঠে এসে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকালেন অ্যারোনেক্স। উত্তর-পূর্বে দেখা গেল অগ্নিগিরি সম্বলিত দুটি দ্বীপ। আর তাদের ঘিরে চল্লিশ মাইল দীর্ঘ এক প্রবাল প্রাচীর।

২৮শে ডিসেম্বর নটিলাস ভ্যানিকোরো ছেড়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে পাপুই দ্বীপ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল।

২রা জানুয়ারী, ১৮৬৮ —

ঠিক এই সময় আমরা যেখানে রয়েছি ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজ এক প্রবাল স্তূপে লেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই প্রবাল প্রাচীর থেকে আমরা এখন মাত্র কয়েক মাইল দূরে।

নটিলাস অতিক্রম করল প্রবাল-সমুদ্র। তার দু' দিন পরেই দিকচক্রবালে দেখা গেল পাপুই দ্বীপের অস্পষ্ট অবয়ব।

আমি এবার টেবেস প্রণালী দিয়ে নটিলাসকে নিয়ে যেতে চাই ভারত মহাসাগরে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

2য় বর্ষ 10ম সংখ্যা ॥ 1983
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

আর এক মাস পরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। তোমরা যারা এবার পরীক্ষা দেবে, তারা সকলেই ভালোভাবে প্রস্তুত হচ্ছ নিশ্চয়। এই সংখ্যায় ভৌতবিজ্ঞান ও ঐচ্ছিক পদার্থবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জীবন-বিজ্ঞান এবং অঙ্কের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে দুটি মূল্যবান আলোচনা আছে। এতে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অনুসরণ করলে তোমরা উপকৃত হবে বলতে পারি। 'আমার প্রিয় বিজ্ঞানী' বিষয়ে আমরা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে যে রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিলুম, তাতে স্থানাধিকারী প্রথম তিনজনের লেখা এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো। লেখাগুলি তোমাদের ভালো লাগবে আশা করি।

তোমাদের অনেকের কাছ থেকে আমরা নানা ধরনের লেখা ও প্রশ্ন পাই, সেসব লেখা ও প্রশ্ন যেন তোমাদের নিজস্ব হয়।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1
চিঠিপত্র 2
বিজ্ঞান-সংবাদ 2

দপ্তর থেকে
মহাজাগতিক রশ্মি ॥ সমরজিৎ কর 3
বিজ্ঞান বিচিত্রা ॥ অনীশ দেব 5

গল্প
তেরো-র গেরো ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ 9

পড়াশোনা
তাপ ॥ অলক চক্রবর্তী 17
ভৌতবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ॥ অমরনাথ রায় 19
ঐচ্ছিক পদার্থবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ॥ শৈলেশকুমার দত্ত 22
অঙ্কের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে ॥ নন্দলাল মাইতি 23
জীবনবিজ্ঞানের আলোচনা ॥ তারকমোহন দাস 35

ছবিতে গল্প
জুলেভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী ॥ গৌতম কর্মকার : প্রচ্ছদ 2, 3
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 9
সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্ক ॥ উজ্জ্বল ধর 16
শীর্ষাশন ॥ উজ্জ্বল ধর 36
ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 45

পশুপাখীর গল্প
নীলকণ্ঠ পাখিদের কথা ॥ অজয় হোম 30

উপন্যাস
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 41

জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
সংক্ষিপ্ততম ঘটনা ॥ অমিতাভ সেন 8
হার্শেলের ধূমকেতু-ইউরেনাস ॥ বিমান বসু 25
চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রথম ॥ বৃন্দাবন বাগচী 33
স্বরহীন পাখি ॥ ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল 40
সাহারা থেকে শীত, মরু থেকে তাপ ॥ সমীর মণ্ডল 34
ভয়ংকর সেই খুনে ধোঁয়াশা ॥ সুমিতা পাল 37
চলমান যাদুঘর ॥ কিন্নর রায় 39
খোস চুলকানি ॥ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 46
তিন পেয়ে না চার পেয়ে ? ॥ অরূপরতন ভট্টাচার্য 47
শূণ্যক ॥ বিকাশকান্তি সাহা 38

বিজ্ঞানের ভেল্কি
কফির গ্লাসে তুফান ॥ এ. সি. সরকার 48

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
ফ্রেডারিক উইলিয়াম হার্শেল ॥ বিবেক রায় 15

আবিষ্কারের গল্প
দেশলাই আবিষ্কারের কাহিনী ॥ প্রণব হোড় 28

ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম 40
স্বয়ংচালিত গাড়ি ॥ জ্যোতিষ সরকার 53
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তর 49 : প্রশ্নোত্তর 50 বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা 50 : পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা : অজিত দেবনাথ 51 ॥ তপন ঘোষ 52 ॥ সৌম্য চট্টোপাধ্যায় 54
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা 56

বিশিষ্ট বিজ্ঞানলেখক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগদান করেছেন।

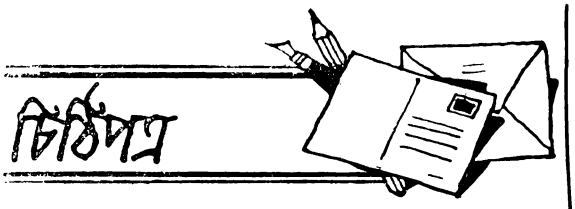

প্রসঙ্গ ঃ জীবনবিজ্ঞানের বিচিত্র প্রশ্ন

'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর গত ডিসেম্বর 82 সংখ্যায় নির্মলেন্দু মাইতির প্রশ্নের উত্তর হিসাবে শ্রদ্ধেয় তারকমোহন দাস যা বলেছেন, তাতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি নি। কারণ আমরা জানি, ছয় মাস বয়সের আগে কোন মানব দেহে অ্যামাইলেজ' নামক উৎসেচক (এনজাইম) উৎপন্ন হয় না এবং সেজন্যেই তার পক্ষে তখন ভাত তথা কোন শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য হজম করা সম্ভব নয়।

কৃষ্ণনির্মাল্য সেন
জি টি রোড, শিবপুর, হাওড়া-২

প্রসঙ্গ ঃ বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

গত জুলাই 82 সংখ্যায় বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, ভারতের প্রথম পারমাণবিক চুল্লীর নাম 'অপ্সরা'। কিন্তু 1974 সালের শারদীয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় দেখলাম, ভারতের প্রথম পারমাণবিক চুল্লী স্থাপিত হয়েছিল 1969 সালে আমেরিকার সহায়তায় বোম্বাই-এর কাছে তারাপুরে। কোন্ তথ্যটি ঠিক ? নাম বলতে কি বোঝায় ?

দিলীপকুমার ঘোষ
কোতুলপুর উচ্চবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

ভারতের প্রথম পরমাণু-চুল্লী হচ্ছে 'অপ্সরা'ই। ডঃ হোমী জাহাঙ্গীর ভাবার পরিচালনাধীনে বোম্বে-এর ট্রম্বেতে পরমাণু শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে 1954 সালের আগস্ট মাসে এটি চালু হয়। তারাপুরে তাপ-পারমাণবিক চুল্লী স্থাপিত হয় তার অনেক পরে। এক একটি পরমাণু চুল্লীকে একটি বিশেষ নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সেই অনুযায়ী ভারতের প্রথম পরমাণু চুল্লীর নামকরণ করা হয় 'অপ্সরা'।

প্রসঙ্গ ঃ সম্পাদ্যের চিত্রাঙ্কনে সতর্কতা

গত জানুয়ারি 83 সংখ্যায় 'সম্পাদ্যের চিত্রাঙ্কনে সতর্ক হওয়া উচিত' শীর্ষক নিবন্ধে 17 পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভের দ্বিতীয় লাইনটি (নিচে থেকে) পড়তে হবে—তিন সেন্টিমিটার রেখাংশ আঁকতে গিয়ে বহু পরীক্ষার্থী তিন ইঞ্চি রেখাংশ আঁকে। এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী কোন নম্বর পায় না।

অসীম মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞান-সংবাদ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 70 তম অধিবেশন

গত 3-8 জানুয়ারি তিরুপতিতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 70তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক বি রামচন্দ্র রাও। এবারের অধিবেশনে মূল্য আলোচ্য বিষয় ছিল 'সমুদ্র ও মানুষ। তেরোটি বিভিন্ন শাখায় এক সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন চলে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় চার হাজার প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করেন এবং 50 জন বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানী এসেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি প্রদত্ত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হয় দশজন তরুণ বিজ্ঞানীকে তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে।

বিষ্ণুপুর (পশ্চিম) বিজ্ঞান পরিষদ

আচার্য জগদীচন্দ্র বসুর 124 তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 24 পরগনার গোতলাহাট শশিভূষণ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিষ্ণুপুর (পশ্চিম) বিজ্ঞান পরিষদ গত 19 ডিসেম্বর একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্র আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের ডঃ বিমলেন্দু মিত্র। আলোচনার উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জয়দেব সামন্ত। বিজ্ঞান ক্লাবের প্রয়োজমীরতা, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ দূষণ ও অপসংস্কৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুকল্যাণ বসু ও দ্বিজেন মুন্সী। পরিষদের লক্ষ্যও কর্মসূচী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক মোঃ বাবুল হোসেন মোল্লা। আচার্য বসুর স্মরণে আবদুল মজিদ রচিত সঙ্গীত দীপক চক্রবর্তীর পরিচালনায় শিল্পী গোষ্ঠী কর্তৃক পরিবেশিত হয় এবং সুকুমার হাজরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। প্রদর্শনীতে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও তথ্যচিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞানের কিছু কিছু নিদর্শন দেখিয়েছে। পরিষদের মাসিক দেওয়াল-পত্রিকা 'বিজ্ঞান-চেতনা'র প্রথম ও জগদীশ বসু সংখ্যা এদিন প্রকাশ পায়।

দপ্তর থেকে

মহাজাগতিক রশ্মি

সমরজিৎ কর

দেখ, বছর চল্লিশ আগেও কেউ যদি প্রশ্ন করত ঃ বলুন তো মহাবিশ্ব বলতে কি বোঝায় ? খুব বেশি ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তখন বলতেন ঃ মহাবিশ্ব বলতে আমরা বুঝি অগণিত নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু আর তাদের মাঝখানে অসীম যে পরিবেশ তার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ধূলিকণা এবং আলো। তবে হ্যাঁ, এই আলোর কথা যে বললাম না, গোলমালটা কিন্তু সেখানেই। আলো না বলে বরং বলি বিকিরণ। এই বিকিরণকে আমরা আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। এক, দৃশ্যমান আলোর বিকিরণ। যে আলোয় আমরা আশপাশের সব কিছু দেখতে পাই, দৃশ্যমান বিকিরণ বলতে তাদেরই বোঝায়। দুই, অদৃশ্য বিকিরণ। এই বিকিরণের মধ্যে পড়ে একস-রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি এবং বেতার রশ্মি বা বেতার তরঙ্গ। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর এই বিকিরণগুলিকে বিজ্ঞানীরা এক কথায় নাম দিয়েছেন 'ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন' বা তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ। আর তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যাদের ধরা হয় তাদের আলোও বলা যেতে পারে, আবার কণাও বলা যায়। এইসব কণাদের মধ্যে কোনটি ধনাত্মক তড়িৎ-ধর্মী, কোনটি ঋণাত্মক তড়িৎ-ধর্মী। আবার অনেকে তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণা।

হয়তো প্রশ্ন করবে ঃ আমাদের পরিচিত তেমন কোন কণা কি আছে ?

নিশ্চয় আছে। হাইড্রোজেন ছাড়া যে কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে থাকে দু'রকম কণা। প্রোটন এবং নিউট্রন। প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎ-ধর্মী এবং নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ। আবার নিউক্লিয়াসের চারপাশে পরিক্রমণ করে আর এক ধরনের কণা, যার নাম ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী কণা। বলতে কি, সূর্য এবং ব্রহ্মাণ্ডজগৎ থেকে আমাদের দিকে নিয়মিত ধেয়ে আসছে নানারকম দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলো ; সেই সঙ্গে বহু রকম কণা। এই আলো এবং কণাদেরই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন মহাজাগতিক রশ্মি। ইংরেজিতে বলা হয় Cosmic Rays।

বলতে কি, মহাজাগতিক রশ্মি বলতে বিজ্ঞানীরা এক সময় মনে করতেন এমন ধরনের রশ্মি, যাদের সৃষ্টি সম্পর্কে কোন খবরই কেউ রাখে না। তাঁরা ধরে নিতেন, এই রশ্মি আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে বহু দূরের কোন নক্ষত্র থেকে এগিয়ে আসছে। পরে অবশ্য জানা যায়, ওই ধরনের রশ্মি আমাদের সূর্য থেকেও বিকীর্ণ হয়। বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মি বলতে যে সব কণার কথা বললাম তাদের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন সবচেয়ে বেশি।

দেখা গেছে, মহাজাগতিক রশ্মির বড় অংশ প্রোটন কণা। তোমরা অনেকেই হয়তো জানো, হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে নিউট্রন থাকে না। থাকে একটিমাত্র প্রোটন কণা। তাই প্রোটনকে 'হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস'ও বলা হয়। এ ছাড়া, মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে থাকে আর এক ধরনের কণা, যাদের বলা হয় হিলিয়াম নিউক্লিয়াস।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, হিলিয়াম গ্যাসের কথাও তো তোমরা অনেকে শুনেছ। হিলিয়াম একটি মৌলিক পদার্থ। বাতাসে গ্যাস হিসেবে মিশে থাকে। হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন। আর সেই নিউক্লিয়াসের চারপাশে পরিক্রমণ করে দুটি ইলেকট্রন কণা। নক্ষত্রের প্রচণ্ড উত্তাপে ওই ইলেকট্রনগুলি প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে থাকে। এবং এক সময় নিউক্লিয়াস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তখন পড়ে থাকে শুধু নিউক্লিয়াস। হিলিয়ামের এই নিউক্লিয়াস ধনাত্মক তড়িৎ-ধর্মী। এর আর এক নাম আলফা কণা। মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে প্রচুর পরিমাণ আলফা কণাও থাকে।

শুধু প্রোটন এবং আলফা কণাই নয়। থাকে নানান মৌলিক পদার্থের আয়নিত পরমাণুও। একটু আগেই বললাম, হাইড্রোজেন পরমাণু ছাড়া সমস্ত মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যেই থাকে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউক্লিয়াস।

মজার ব্যাপার এই, সাধারণ অবস্থায় পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যত সংখ্যক প্রোটন থাকে, সেই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে পরিক্রমণ করে ঠিক তত সংখ্যক ইলেকট্রন। কিন্তু সূর্য অথবা অন্যান্য নক্ষত্রে প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে পরমাণুর এক বা একাধিক ইলেকট্রন কণা ছিটকে বাইরে বেরিয়ে গেলে, ইলেকট্রনের সংখ্যাই শুধু কমে, প্রোটনের সংখ্যা যা ছিল তাই থাকে।

ধরো, কোন একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে রয়েছে 8টি প্রোটন। স্বাভাবিক অবস্থায় এ ক্ষেত্রে ওই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে পরিক্রমণ করবে 8টি ইলেকট্রন, এবং সেই সঙ্গে পরমাণুটি হবে তড়িৎ-নিরপেক্ষ। এখন, ওই ইলেকট্রনগুলির যদি একটি ছিটকে বাইরে চলে যায়, তা হলে নিউক্লিয়াসের চারপাশে অবশিষ্ট 7টি ইলেকট্রনের তুলনায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে 1টি প্রোটন রইলো বেশি। এই অবস্থায় পরমাণুটি আয়নিত হলো বলে বলা হবে। ধনাত্মক আয়ন। পরমাণু থেকে যত বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন সরিয়ে নেওয়া হবে, পরমাণুটির ধনাত্মক তড়িৎক্ষমতাও তত বাড়বে। সেই সঙ্গে আয়নের শক্তিও যাবে বেড়ে। মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে লোহার আয়নে কখনো কখনো 13 থেকে 15টি ইলেকট্রন অনুপস্থিত থাকে। এ ধরনের কণার শক্তি কখনো কখনো কয়েক কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট হয়। এখানে বলে রাখি, দুটি বিন্দুর মধ্যে যদি তড়িৎ-বিভবের পার্থক্য 1 ভোল্ট হয়, তখন এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে (প্রথম বিন্দুর বিভব কম) যেতে গেলে একটি ইলেকট্রনের যতটা শক্তি দরকার সেই শক্তির পরিমাণকে বলা হয় 'এক ইলেকট্রন ভোল্ট।' বৈজ্ঞানিক ভাষায় '1 eV।'

হিসেব করে দেখা গেছে, সূর্য এবং মহাবিশ্ব থেকে যে পরিমাণ মহাজাগতিক রশ্মি বর্ষিত হচ্ছে তার 90 শতাংশই প্রোটন কণা বা হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস, 1 শতাংশ আলফা কণা। মজার ব্যাপার হলো, মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে এমন তিনটি মৌলিক পদার্থের আয়নিত অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে, পৃথিবীতে যাদের পরিমাণ খুবই কম, অথচ মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে বেশি। কম করেও 10,000 গুণ বেশি পদার্থ তিনটি হলো লিথিয়াম, বেরিলিয়াম এবং বোরন। সূর্য এবং নক্ষত্রগুলিতেও এই পদার্থ তিনটি খুব কম পরিমাণে আছে বলেই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। যদি তাই হয়, মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে এদের পরিমাণ এতটা বেশি কেন?

আরও একটি মজার কথা বলি। মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে যে প্রোটন কণা থাকে তাদের শক্তির পরিমাণ কত জানো? এক একটি প্রোটনের শক্তি 10^{10} ইলেকট্রন ভোল্ট। এ ধরনের একটি প্রোটনের শক্তির সাহায্যে একটি ইলেকট্রক বাল্ব জ্বালানো যায়।

না, মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে থাকে আরো নানারকম কণা। যেমন নিউট্রন, তড়িৎ নিরপেক্ষ পাই মেসন, আহিত মেসন (ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক দুই-ই), অ্যান্টি-প্রোটন, পজিট্রন, গামা রশ্মি, একস্ রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি, নিউট্রিনো, নিউ মেসন প্রভৃতি। এই সব রশ্মির ধর্ম পরীক্ষা করে মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। জানতে পেরেছেন নক্ষত্রের স্বরূপ।

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের জীবন ও গবেষণার কথা
স্বাদু ও রম্য ঢঙে লিখেছেন জনপ্রিয় বিজ্ঞানলেখক

সমজিৎ করের
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫·০০

শৈব্যা * প্রকাশনবিভাগ ● ৮/১এ,শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

অনীশ দেব

ভয় পেয়ে চমকে উঠলে

ভয় পেলে আমরা চমকে উঠি, না চমকে উঠে আমরা ভয় পাই? কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে এমনিতে বলা খুব মুশকিল। তবে এটুকু সহজেই বোঝা যায় অপ্রত্যাশিত এবং অস্বাভাবিক কিছু দেখলে বা ঘটলে আমরা চমকে উঠি কিংবা ভয় পাই। আমাদের পাঁচ-পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটা আমাদের খবর দেয় কি ঘটছে। তারপর আমাদের মস্তিষ্ক দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসে। সে হচ্ছে একটা জটিল কম্পিউটার। তার কোষে কোষে বিভিন্ন স্মৃতি ও খবর জমা আছে। সে স্নায়ুতন্ত্রীর মারফৎ ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে প্রথমে খবর পাবে আসলে কি ঘটেছে। তারপর সেই ঘটনাটা সে তুলনা করে, বিচার করে দেখবে তার মণিকোঠায় জমানো বহু তথ্যের সঙ্গে। তারপর সে সিদ্ধান্ত নেবে ঘটনাটার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কি করা উচিত। সেই নির্দেশ স্নায়ুতন্ত্রী বেয়ে এসে পৌঁছবে আমাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, তারপর আমরা কাজে নামব।

ধরা যাক তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ। হঠাৎই তোমার সামনে লাঠি হাতে এক ডাকাত হাজির হলো। অতীতের অভিজ্ঞতা কিংবা কারো কাছে শুনে বা কোন বই-এ পড়ার ফলে তোমার মস্তিষ্কে ঠিক এই খবরটি সঞ্চিত আছে যে, 'লাঠি হাতে ডাকাত অত্যন্ত বিপজ্জনক'। সুতরাং তোমার চোখ মস্তিষ্কে এই খবর পাঠাতেই 'কম্পিউটারের' উত্তর এসে গেল—'সাবধান! সামনে বিপদ!' এবং একই সঙ্গে সে তোমাকে আরও নির্দেশ দেবে তোমার এই মুহূর্তে কি করা উচিত। রুখে দাঁড়ানো উচিত, পুলিস ডাকা উচিত, না পালানোটাই ঠিক হবে।

অর্থাৎ, তুমি অপ্রত্যাশিত জিনিস বা ঘটনা ঘটতে দেখে চমকে উঠেছ, তারপর ভয় পেয়েছ।

মজার ব্যাপারটা এবারে বলি। যদি এই একই ঘটনা ঘটত কোন মঞ্চের ওপরে, নাটকের পর্দা ওঠার পর, তা হলে তুমি হয়তো মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠতে, কিন্তু ভয় কিছুতেই পেতে না। কারণ তোমার মস্তিষ্ক সব কিছু দেখেশুনে তোমাকে জানিয়ে দিত, এই ডাকাত নকল ডাকাত; অভিনয় করতে এসেছে; কারো গায়ে আঁচড়টিও কাটে না।'

তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রতিক্রিয়া অনেকগুলো জিনিসের ওপর নির্ভর করে। আর সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের মস্তিষ্ক।

এই চমকে ওঠা নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদেরা বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তারই মধ্যে একটা পরীক্ষা হচ্ছে পিস্তলের শব্দে চমকে ওঠার পরীক্ষা।

খুব জোরে পিস্তলের শব্দ হলে আমরা প্রথমেই চোখ

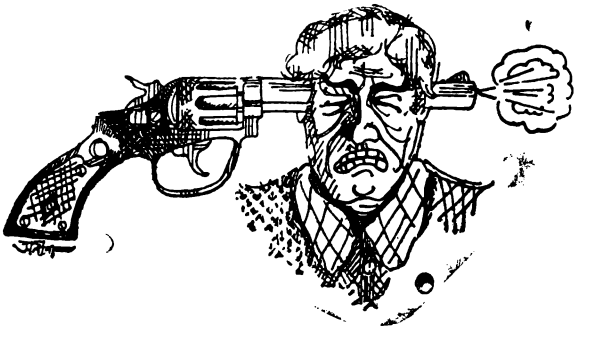

বুজে ফেলি। আগে থেকে শত জানা থাকলেও চোখ না বুজে পারি না। এ ছাড়া পরিবর্তী প্রতিক্রিয়ায় আমাদের দেহ সামান্য কুঁকড়ে যায়। এই পুরো ঘটনাটা ঘটতে সময় লাগে আধ সেকেণ্ডেরও কম। কিন্তু বিজ্ঞানীরা খুব 'স্লো মোশনে' ছবি তুলে এই প্রতিক্রিয়াকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। সেকেণ্ডে পনেরোশো ছবি তুলতে পারে এমন মুভি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে তারপর সেই ছবি অত্যন্ত ধীরে কোন পর্দার ওপর ফেলে সমস্ত খুঁটিনাটি ধরা পড়েছে তাঁদের চোখে। দেখা গেছে, এই চমকে ওঠার নমুনা, ছোট বড় সবার ক্ষেত্রেই মোটামুটি একরকম। এমনকি যেসব সৈনিক বা শিকারী নিত্য পিস্তলের বিকট শব্দ শুনতে অভ্যস্ত, তারাও এই প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রেহাই পায় নি।

হঠাৎ কারো চোখে আলো ফেললে বা ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢেলে দিলে এইরকম কুঁকড়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় বটে। তবে পিস্তলের আওয়াজের ক্ষেত্রে যেমনটা দেখা যায়, এই প্রতিক্রিয়া সেরকম জোরালো নয়।

ভয় পেলে আমাদের শরীরের ভেতরের কলকব্জার কাজে কিছু হেরফের দেখা যায়। যেমন, হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি অনেক বেড়ে যায়, বা পেটটা কেমন খালি খালি লাগে, কিংবা শরীরটা কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ে, শরীরে কুল কুল করে ঘাম দেয়—এরকম আরো কত কি।

তবে এর মধ্যে শতকরা প্রায় ছিয়াশি জন মানুষের যে লক্ষণটা খুব জোরালোভাবে দেখা যায়, সেটা হলো হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায় অস্বাভাবিক রকম।

আমাদের নানারকম আবেগের কার্যকারণ নিয়ে মার্কিন বিজ্ঞানী জেম্‌স্ ও ডেনমার্কের বিজ্ঞানী ল্যাঙ এক বিতর্কিত তত্ত্ব প্রকাশ করেন আনুমানিক 1880 সালে। তাঁরা বলেন, ভয় পেয়ে শরীরের ভেতরে নানান কলকব্জা অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে, এবং তার ফলস্বরূপ আমাদের মনে ভয়ের অনুভূতি জাগে।

তার আগে সাধারণ বুদ্ধির বিচারে মানুষের ধারণা ছিল, ভয়ের অনুভূতি হলেই আমাদের শরীরের কলকব্জা বেহিসেবী কাজ করে। অথচ জেম্‌স্ ও ল্যাঙ বললেন ঠিক এর উল্টো। পরে তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে পরীক্ষা করতে গিয়ে একাধিক বিজ্ঞানী উল্টো ফলাফল পেয়েছেন। এবং এ নিয়ে বিতর্কের সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি সম্ভবত আজও হয় নি।

ব্রহ্মাণ্ডের বয়েস কত ?

অধুনা বিশ্বতত্ত্বের জন্ম হওয়ার বহু আগে থেকেই মানুষ ভেবেছে কি করে সৃষ্টি হলো এই বিশ্বজগৎ ? কি করে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছলো লক্ষ কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের দল ? বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম ও জাতি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিভিন্ন বয়েস হিসেব করেছে। তার মধ্যে হিন্দু ধর্মের বিষ্ণু পুরাণের হিসেবই মোটামুটিভাবে সবার সেরা। কারণ আজকের বিশ্বতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের যে বয়েস হিসেব করা হয়েছে, বিষ্ণু পুরাণের হিসেব তার একরকম কাছাকাছি। বিষ্ণু পুরাণের মতে ভগবান ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন এই ব্রহ্মাণ্ড। এটা তো নাম শুনেই তোমরা বুঝতে পারছ। এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের আয়ু স্বয়ং ব্রহ্মার একদিনের সঙ্গে সমান।

এবারে ব্রহ্মার এক দিনের হিসেবটা দেওয়া যাক।

চার যুগের কথা তোমরা সবাই জানো : সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি। এই চার যুগ নিয়ম করে একের পর এক আসে। এইভাবে যখন মোট চার হাজার যুগ পার হয়, তখন পূর্ণ হয় ব্রহ্মার একটি দিন। আবার এক-এক যুগ তিন হাজার স্বর্গীয় বর্ষের সমান। আমরা যে বছরের হিসেবের সঙ্গে পরিচিত, তার তিনশো ষাটটা জড়ো হলে একটা স্বর্গীয় বর্ষ হয়।

সুতরাং ওপরের তথ্যগুলো নিয়ম মতো গুণ করে হিসেব করলে পাওয়া যাবে ব্রহ্মার একটি দিনের অর্থ চারশো বত্রিশ কোটি বছর।

বর্তমানে প্রচলিত বিশাল বিস্ফোরণ তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়েস মোটামুটি এক হাজার কোটি বছর। অতএব দেখা যাচ্ছে, আমাদের পুরাণের হিসেব একেবারে ফেলনা নয়।

যে কোন সংখ্যার বর্গমূল

বর্গমূল বের করার সাধারণ পদ্ধতি তোমরা হয়তো জানো। অঙ্কের বই-এ সেই নিয়ম বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। সাধারণ ভাগের যে পদ্ধতি, তারই সামান্য হেরফের ঘটিয়ে বর্গমূল বের করার পদ্ধতি তৈরী হয়েছে। যেসব সংখ্যা পূর্ণবর্গ, যেমন, 16, 25, 100, 196, ইত্যাদি, তাদের বর্গমূল বের করা তেমন কঠিন নয়, কিন্তু 13, 17, 20, 68, এই জাতীয় সংখ্যা হলে বর্গমূল বের করার খানিকটা অসুবিধে দেখা দেয়।

আমরা এবার একটা নতুন নিয়মের কথা বলব, যা দিয়ে খুব সহজে অথচ মোটামুটি নিখুঁতভাবে যে কোন সংখ্যার বর্গমূল বের করে ফেলা যাবে। এই নিয়মে আমরা কিন্তু লেখচিত্রের সাহায্য নেবো।

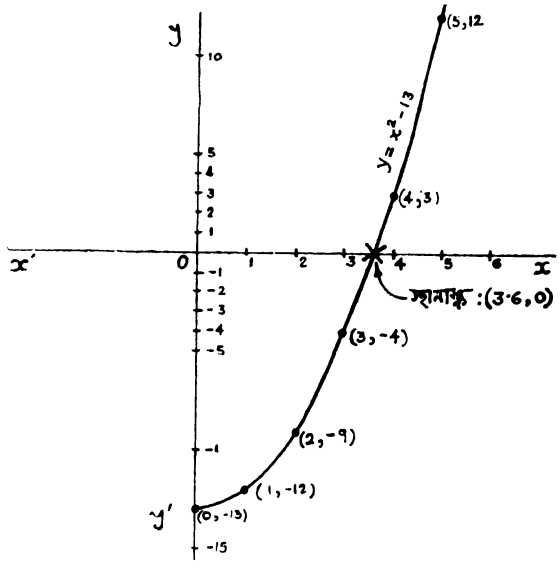

ধরা যাক, 13 এই সংখ্যাটির বর্গমূল আমাদের বের করতে হবে। তা হলে আমরা ধরে নেব, নির্ণেয় বর্গমূল x।

অতএব, $x^2 = 13$

অথবা $x^2 - 13 = 0$ — —(1)

অথবা, মনে করি, $y = x^2 - 13$- (2)

এই (2)নং সমীকরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যখন $y = 0$ হবে তখনই $x^2 = 13$ হবে। এখন আমরা করব কি, একটা লেখচিত্রের ছক কাটা কাগজে, x-অক্ষ এবং y-অক্ষ এঁকে ফেলব। তারপর x-এর বিভিন্ন মান বসিয়ে y-এর বিভিন্ন মান বের করব। যেমন, যখন

$x = 1,\ y = -12$
$x = 3,\ y = -4$
$x = 4,\ y = 3$

ওপরের (2)নং সমীকরণের সাহায্যে x-এর বিভিন্ন মানের জন্যে y-এর বিভিন্ন মান নির্ণয় করে আমরা একটা তালিকা তৈরী করে ফেলতে পারি।

x	0	1	2	3	4	5
$y = x^2 - 13$	-13	-12	-9	-4	3	12

এবং লেখচিত্রে (x, y) বিন্দুগুলো যথাযথভাবে বসিয়ে এঁকে ফেলতে পারি (2)নং সমীকরণের লেখচিত্র।

এখন লেখচিত্র থেকে সেই বিন্দুটি খুঁজে বের করব, যে বিন্দুতে y-এর মান শূন্য। কারণ একমাত্র তখনই $x^2 = 13$ হবে, এবং সেই বিশেষ বিন্দুতে x-এর যা মান, সেটাই হলো 13-এর বর্গমূল।

ওপরের তালিকা থেকে একটি জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, x-এর মান যখন 3 ও 4-এর মাঝামাঝি কোন এক জায়গায়, তখন y-এর মান শূন্য হবে। কারণ যখন $x = 3$, $y = -4$, অর্থাৎ, ঋণাত্মক রাশি। আবার যখন $x = 4$, তখন $y = 3$, অর্থাৎ, ধনাত্মক রাশি।

তোমরা তো জানো, y যদি ঋণাত্মক থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে ক্রমে ধনাত্মক হতে চায়, তা হলে কোন না কোন সময়ে তাকে শূন্য হতেই হবে। আর সেই বিশেষ জায়গাটাই আমরা খুঁজে পেয়েছি লেখচিত্র থেকে। তবে তালিকা থেকে এটুকু বুঝতে পারছি, 13-এর বর্গমূল 3 ও 4-এর মধ্যে।

লেখচিত্র থেকে আমরা পেলাম 13-এর বর্গমূল 3·6। যদি এই বর্গমূল আরো নিখুঁতভাবে বের করতে হয়, অর্থাৎ দশমিক চিহ্নের পর দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ ঘরের সংখ্যাগুলো নির্ণয় করতে হয়, তা হলে আবার আমাদের লেখচিত্রের সাহায্য নিতে হবে। তবে এইবার x-এর মান ধরতে হবে 3·6, 3·61, 3·62 ইত্যাদি সংখ্যাগুলো। এবং x-এর এই সব মানের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে y-এর মান। ফলে তৈরি হবে আমাদের দ্বিতীয় তালিকা। এবং আমরা দ্বিতীয় লেখচিত্র এঁকে ফেলব। প্রথমবারের মতো এবারেও x-অক্ষের সঙ্গে লেখচিত্রের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক থেকে নির্নীত হবে 13-এর বর্গমূল দু' দশমিক স্থান পর্যন্ত। যদি লেখচিত্রে x-অক্ষের স্কেল বেশ বড় মাপে ধরা হয়, তা হলে আমরা তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূলের মানও পেতে পারি।

ওপরের পদ্ধতি থেকে মনে হতে পারে, নিয়মটি মোটেই সুবিধের নয়। কারণ প্রচুর পরিশ্রম করে দু-তিন বার তালিকা তৈরি করাটা একটুও সহজসাধ্য নয়। হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। সুতরাং এই নিয়মের গুপ্ত রহস্যটি এবার শুনে নাও। এই যে তালিকা তৈরির ব্যাপারটা, এটা কিন্তু তোমাকে তৈরি করতে হবে না। তোমার-আমার হয়ে এই তালিকা তৈরি করে দেবে কম্পিউটার। তুমি শুধু লেখচিত্র এঁকেই খালাস। এই নিয়মটাকে বলা হয় সাংখ্যিক পদ্ধতি বা নিউম্যারিকাল মেথড।

এইরকম বহু সাংখ্যিক পদ্ধতি আছে। বড় হয়ে তোমরা যখন গবেষণা করবে তখন নানান সাংখ্যিক পদ্ধতি তোমাদের কাজে লাগবে।

ওপরের এই পদ্ধতিতে শুধু বর্গমূল কেন, x-এর যে কোন ঘাতের সমীকরণেরই সমাধান করা যায়। আর এটাই হলো এই পদ্ধতির আসল সুবিধে। যেমন,

$$x^4 - 2x^3 + 8x^2 + 7x - 10 = 0,$$

এই সমীকরণটিকেও একইভাবে সমাধান করে ফেলা যায়। তবে এক্ষেত্রে ডিজিটাল কম্পিউটারের শরণাপন্ন তোমাকে হতেই হবে।

জেনে রেখো, এই সাংখ্যিক পদ্ধতি ও কম্পিউটার, এরা দুজনে অবিচ্ছেদ্য সুহৃদ। সব সময় হাতে হাত মিলিয়ে এরা বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে চলে।

বিজ্ঞান-কলেজ, কলিকাতা-9

সংক্ষিপ্ততম ঘটনা

অমিতাভ সেন

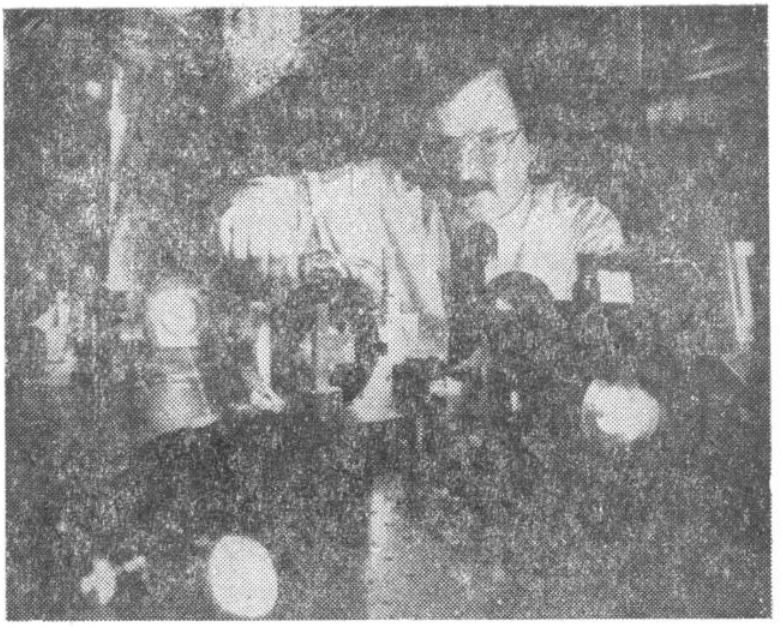

তাড়াতাড়ি বোঝাতে আমরা বলি 'মুহূর্তের মধ্যে'। এটা কিন্তু স্রেফ কথার কথা। হিসাব মতো 'মুহূর্ত' বেশ বড়সড় সময় জোড়া ব্যাপার। এক মুহূর্ত দিনরাতের তিরিশ ভাগের এক ভাগ বা 48 মিনিট। আসলে মুহূর্ত শব্দটা আমরা 'নিমেষে' অর্থে ব্যবহার করি। 'নিমেষে' মানে চোখের পলক পড়তে যতটুকু সময় লাগে। 'নিমেষে' 'চোখের পলকে', 'এক লহমায়' সবেরই একই মানে। কিন্তু চোখের পলক পড়তে সত্যিই কি খুব কম সময় লাগে? কম বেশির ব্যাপারটা অবশ্যই আপেক্ষিক। আলো যেখানে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল অতিক্রম করে চলে যায় সেখানে এক নিমেষ নিশ্চয় খুব কম সময় নয়। বাংলায় যেমন মুহূর্ত ইংরেজিতে বলে 'ইন্ এ মোমেণ্ট'। কিন্তু আধুনিক বিচারে মোমেণ্ট মোটেই নগণ্য সময় নয়—এক সেকেণ্ডের আট ভাগের এক ভাগ। সেদিক দিয়ে বরং বাংলার পল, বিপল, অনুপল অনেক সূক্ষ্ম হিসাব দেয়। পলের ষাট ভাগের এক ভাগ বিপল সেকেণ্ডের হিসেবে এক সেকেণ্ডের 5 ভাগের 2 ভাগ। আর অনুপল হলো? বিপলের 1/60 ভাগ অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের দেড়শো ভাগের এক ভাগ। অন্যভাবে বললে 150 বিপলে এক সেকেণ্ড।

কিন্তু এসবই এখন খুব মোটা দাগের হিসেবনিকেশ। পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের সময়ের মাপজোখ নেওয়ার জন্যে ব্যবহার হয় কেমটো সেকেণ্ডের হিসাব। এক কেমটো সেকেণ্ডে হলো এক সেকেণ্ডের দশ কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ। যেটাকে সংক্ষেপে অংকে এই ভাবে লেখা যায়।

10^{-15} কেমটো সেকেণ্ড = 1 সেকেণ্ড

সম্প্রতি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম ঘটনা ঘটিয়েছেন বেল্ ল্যাবরেটরির লেজার বিভাগের পদার্থ-বিদরা। বিজ্ঞানী চার্লস শ্যাঙ্ক আলোর এমন ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন যার স্থায়িত্ব মাত্র তিরিশ কেমটো সেকেণ্ড। এই আলোর স্পন্দন শুধু সময়ের মাপেই নয়, দৈর্ঘ্যেও খুবই ছোট। 30 কেমটো সেকেণ্ডব্যাপী এই আলোকস্পন্দনের দৈর্ঘ্য মাত্র নয় মাইক্রোমিটার অর্থাৎ চোদ্দ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান।

'আনসারটেন্‌টি প্রিন্সিপাল অনুযায়ী একটি আলোক স্পন্দনের স্থায়িত্বকে সেই আলোকের বর্ণালীর বিস্তৃতি (স্পেকট্রাল উইড্‌থ্) দিয়ে গুণ দিলে যে গুণফল পাওয়া যায় সেটার মান একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের চেয়ে কম হতে পারেনা। এর কলে লেজারের স্পন্দনের স্থায়িত্বকাল একটি নির্ধারিত নিম্নতম মানের চেয়ে কমানো যায় না। সেজন্যেই এই ক্ষুদ্রতম ঘটনাটি ঘটানোর জন্যে বিশেষ ধরনের লেজার নিয়ে কাজ করতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের।

এই সংক্ষিপ্ততম ঘটনাটি শুধু বৈজ্ঞানিক কসরৎ নয়। সময়কে এইরকম খুব ছোট টুকরোয় ভাগ করতে না পারলে পারমাণবিক গবেষণার অগ্রগত ব্যাহত হত। বিশেষ করে সেমিকণ্ডাকটর বস্তু, জীবকোষ ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার অভ্যন্তরে যে সব অত্যন্ত, দ্রুত ঘটনা ঘটে সেগুলি মাপবার জন্যে 30 কেমটো সেকেণ্ডের এই ইউনিট ও খুব ছোট নয়। বিজ্ঞানী শ্যাঙ্ক বলেছেন, 'একটা বিক্রিয়া ঘটার প্রথম তিরিশ থেকে পঞ্চাশ কেমটোসেকেণ্ডের মধ্যে বহু অজানা ঘটনা ঘটতে শুরু করে—সেটা রাসায়নিক হতে পারে, জড়সংক্রান্ত কত পারে, জৈবও হতে পারে।' এবার সেগুলি অনুধাবন করা যাবে। তিরিশ কেমটোসেকেণ্ড ব্যাপী এই ক্ষুদ্রতম আলোকস্পন্দন এখন পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের স্টপ ওয়াচের নিম্নতম কাউণ্ট যার হিসাব পাওয়া যায়।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানী শ্যাঙ্ককে। বিজ্ঞানী শ্যাঙ্কের ভাষায় "এক সেকেণ্ডে আলোক স্পন্দন প্রায় চাঁদ অবধি পৌঁছতে পারে কিন্তু 30 কেমটোসেকেণ্ডে আলো মানুষের চুলের তিনভাগের এক ভাগও অতিক্রম করতে পারবে না।"

বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

তিন বৎসর নিষ্ঠার সঙ্গে বিনা মাইনেয় জগদীশচন্দ্র তাঁর অধ্যাপনা চালিয়ে গেলেন। ফলে একদিন শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার টনক নড়ল

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

তেরো-র গেরো

সিদ্ধার্থ ঘোষ

গামছায় হাত মুছতে মুছতে প্রসাদকে বলছিলুম, 'বুঝলি আমাদের মেসে যে রকম স্বাস্থ্যকর মাছের ঝোল খাওয়াচ্ছে, এরপর আর হাত ধোওয়ার জন্য সাবান খরচ করতে হবে না।'

'কি ব্রাদার! একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি মনে হচ্ছে?'

পিছনে মৈত্র মশাইয়ের গলা পেয়েও চমকাইনি। আর তো মাত্র ঘণ্টা ছয়েক হাতে আছে। তারপরেই স্টীল এক্সপ্রেসে উঠে বসতে হবে। কলকাতা ছেড়ে চলে যাব আমরা তিনজনে সেই খড়্গপুরে! মৈত্র মশাইয়ের তো ইচ্ছে ছিল গত রাতটা আমাদের মেসেই কাটাবেন।

'খাওয়াদাওয়া করে বেরিয়েছেন তো?' প্রসাদ জিজ্ঞেস করলো।

'নিশ্চয়! নিশ্চয়! জানোই তো আমার দিনটা শুরু হয় তোমাদের চেয়ে অনেক আগে। বরং এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করতে পার তো—' খাকি বুশশার্টের পকেট থেকে ছোটখাট তোয়ালের মতো একটা রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন। আশ্চর্য হচ্ছে, এই অতিকায় রুমালটা ওনার হাতে এতটুকু বেমানান নয়। এমন কি মাসটা জানুয়ারি জানার পরেও না।

প্রসাদ চায়ের কথা বলতে গেল। পিছন ফিরে দেখি, দরজার পাশে দুটো মিলিটারি রঙের হ্যাভারস্যাক পেট ফুলিয়ে বসে। যেন অতিরিক্ত খেয়ে হাঁসফাঁস করছে। হাসি চাপতে পারলাম না, 'করেছেন কী! এত জিনিসপত্র। মাত্র তিন দিনের জন্য বাইরে থাকা—'

মৈত্র মশাইয়ের বিকার নেই, 'ওসব তোমরা বুঝবে না! ইয়ং ব্লাড্ তো। সমস্ত এমারজেন্সি প্রভিশান আছে এর মধ্যে। যে কোন পরিস্থিতি সামাল দেবে। তিন দিন হোক বা এক দিন—দুর্ঘটনার কি দিনক্ষণ আছে? ভালো কথা, এখান থেকে আমরা যাচ্ছি কিসে?'

বাসেই যাওয়া যেত, কিন্তু ওই হ্যাভারস্যাকের দাবি মেটাতে এখন ট্যাক্সি ছাড়া নিশ্চয়.....কিছু বলার আগেই উনি বলে উঠলেন, 'ট্যাক্সি নিতেই হবে, কি বলো? অফিসটাইমে বাসে ওঠা ঠিক নয়।'

বিকেল চারটের সময়টা কি করে অফিস-টাইম হয় জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। ওনার মতে যে-দিন অফিস কাচারি খোলা থাকে, সেদিন সারাক্ষণই অফিস-টাইম।

'বুঝলে ব্রাদার, আর যাই হোক পকেটমারের খপ্পরে পড়তে রাজী নই। কিন্তু তখন তো ট্যাক্সি পাওয়াও বেশ ঝামেলা হবে। আগে থেকে একটাকে বলে কয়ে রাখব নাকি?'

প্রসাদ চায়ের কাপ হাতে ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। চিন্তার কারণ নেই।'

চায়ের কাপ দেখে মৈত্র মশায় পরিবহন সমস্যার কথা ভুলে গেলেন। 'দাও দাও! চমকৎকার—তোমাদের মেসের চা-টা কিন্তু রিয়ালি দারুন। এর জন্যেই না এখানে উঠে আসতে হয়।'

সশব্দে অনেকটা হাওয়া সমেত চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। তারপরেই আহ্ শব্দে পরম তৃপ্তি। আমি শিউরে উঠলুম। সিকি কাপ চা অদৃশ্য হয়ে গেছে। জিভ তো পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কথা। অবশ্য আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়ে মনোজিৎ মৈত্রের বিচার করতে গেলে পদে পদে ভুল হওয়ারই কথা। বাঙালীর মধ্যে এমন চেহারা খুব কমই চোখে পড়ে। কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল। মালকোঁচা আঁটা ধুতি। খাকি কাপড়ের থান কিনে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তৈরী বুশশার্টের চারটে পকেটের কোথাও আর তিল ধারণের স্থান নেই। বুক পকেটের একটায় তোয়ালে রুমাল, অন্যটায় পলিথিন জড়িয়ে রবার গার্টার আঁটা এক তাড়া 'প্রয়োজনীয় কাগজপত্র' (দলিল দস্তাবেজও বলা যেতে পারে)। জামার নিচের দিকে বাঁ হাতের কাছে পকেটে চার ব্যাটারির টর্চ (দিনদুপুরেও থাকে) আর ডান দিকেরটায় কয়েকশো চাবির একটা বোঝা। এই ড্রেস ছাড়া এবং এই সব সরঞ্জাম বিনা আজ অবধি তাঁকে কখনো বাড়ির বাইরে পা দিতে দেখিনি। প্রথম আলাপের পর একবার জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন, 'বুঝলে না ব্রাদার, ব্যাচিলার মানুষ। সারাটা জীবনই তো দিশেরগড়ে কাটিয়ে দিলাম একা-একা। এটা একটা অভ্যেসের ব্যাপার।'

প্রসাদ অবশ্য তখুনি হেসে আপত্তি করেছিল, 'এটা বোধহয় ঠিক বললেন না। যদ্দুর জানি, বছরের মধ্যে আট মাস আপনার বাড়িতে গেস্ট থাকত।'

বেঙ্গল কোল্ কম্প্যানির পুরনো জমানার বড় বাবু মৈত্র মশায়। ভারতের কয়লাখনির ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে বছর পাঁচেক আগে একবার দিশেরগড়ে গিয়েছিল প্রসাদ।

তখনই আলাপ। শুধু চেহারা আর সাজসজ্জা নয়, মনের দিক থেকেও মৈত্র মশাই খাপছাড়া। সাহেবী আমলে অফিসে ঢুকেছিলেন অথচ খাদের শ্রমিক থেকে কোলিয়ারি ম্যানেজার পর্যন্ত যথাক্রমে ভালবাসত ও সমীহ করত তাঁকে। মানুষ যে মেরুদণ্ডী জীব এটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় মৈত্র মশায়ের সঙ্গে মেলামেশা করলে। অবশ্য এইজন্যেই তাঁকে চাকরির মেয়াদ ফুরোবার দু'বছর আগেই আটান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করতে হয়েছে। সাধারণভাবে প্রাপ্য দু'বছরের এক্সটেন্শান্ দিতে রাজী হননি ন্যাশানালাইজ্‌ড্ কোলিয়ারির বর্তমান কর্ণধার। সেও এক গল্প। ম্যানেজারের বৌ ফোন করে অফিসের গাড়ি চেয়েছিল, বাজার করতে যাবে। পুন্ অফিসার মৈত্র বাবু সবিনয়ে তাঁকে একটি রিকুইজিসান স্লিপ্ সই করে পাঠতে বলেছিলেন। তারই পরিণতি —শুধু রিটায়ার নয়, দিশেরগড়ও ছাড়তে হয়েছিল। সারা জীবনের সঞ্চয় বলতে বেনেপুকুরে ছোট্ট একটা বাড়ি। বাকি সব গেছে অতিথিনারায়ণদের সৎকারে। প্রসাদের মুখে তার দু'চারটে নমুনা যা শুনেছি, হাসিও পাবে রাগও হবে। কোনো বন্ধুর বন্ধুও দিশেরগড়ে আসছে জানিয়ে চিঠি দিলে রাতের ঘুম ঘুচে যেত তাঁর। এক মাস আগে থেকে শুরু হত চাল ডাল ঘি সংগ্রহ। বাড়তি একটা কাজের লোকও নিতেন। সারা বছরের লোকটা যদি হঠাৎ ঠিক তখনই অসুখে পড়ে—সাবধানের মার নেই। তারপর উৎকণ্ঠা, কখন আসবেন অতিথি। আসার দিনক্ষণ পেরিয়ে গেলে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে একবার বাস স্ট্যাণ্ড, একবার স্টেশান। এমনও হয়েছে যে মৈত্রবাবু রেজিস্টার্ড পোস্টে ভাবী অতিথির কাছে নিজের ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দিয়েছেন যাতে স্টেশানে তাঁকে দেখে চিনতে কোন অসুবিধে না হয়। গতবছর উনি কলকাতায় বেনেপুকুরের বাড়িতে উঠে আসার পর থেকে আমাদের মধ্যে যোগাযোগটা নিয়মিত হয়েছে। তাছাড়া প্রসাদ হস্তক্ষেপ না করলে উনি নিজের বাড়িতেও ঠাঁই পেতেন না। এক বাল্যবন্ধুর বড়দার ছেলেকে থাকতে দিয়েছিলেন। খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারেই তারা নানা ঝামেলা পাকিয়েছিল। পাড়ার ছেলেদের দিয়ে শাসানি দেওয়ায় দয়া করে একটি ঘর ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য গত এক বছরের মধ্যে ভাইপো (মানে পাতানো ভাইপো) ও নাতি-নাতনীদের গুণপনার ব্যাখ্যান কত যে শুনেছি···কে ভাল গান গায়, কে একদিন দুপুরে চারটে পাকা চুল তুলে দিয়েছিল (বদলে চারটে টাকা নিয়েছিল, সেটা জেরা করার পর জানা গেছে) ইত্যাদি।

মৈত্র মশায়কে একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'আপনার ঘরে তো আসবাব বলতে গোটা পাঁচেক টিনের তোরঙ্গ, আর কটা হ্যাভারস্যাক্। ঘরের দরজাও তো মাত্র একটা। কতগুলো তালা লাগান? পকেটে এত বড় চাবির থোলা?'

'দূর্!' একগাল হেসে তিনি বললেন, 'চাবিগুলো তালখোলার জন্যে নাকি! ওসব কারবার ব্যাপার। বাঁ পকেটে টর্চটা থাকে যে, জামাটা ওই দিকে ঝুলে পড়ে তাই কাউণ্টার ব্যালেন্স। বুঝলে না?'

—মৈত্র মশায় সম্বন্ধে অনেক কথা বললুম, কিন্তু জানি প্রসাদ হলে কক্ষনো এখানে থামতনা। প্রথমেই ও জানিয়ে দিত, কিছুদিন যাবত মৈত্র মশায়ের আঙুলগুলোর ওপর রত্নপাথররা আক্রমণ চালাচ্ছে। রুপোর বাঁধানো একটা লাল-পলা দিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন দু'হাতের মধ্যে চারটে আঙুল শুধু বাকি। এরকম জাঁদরেল একটা মানুষের পক্ষে নেহাতই বেমানান। তাছাড়া কলকাতায় আসার আগে তাঁকে এই দৈবরোগে ধরেনি। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এর পিছনে ভাইপো-কুলের স্বার্থজড়িত। অবশ্য সে-কথা ঘুণাক্ষরেও তাঁর কাছে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর ভালবাসা অন্ধ। প্রসাদ একদিন বলছিল আজকের দিনে সারল্য সবসময়ে মানুষের উপকারে লাগেনা। ধূর্তদের সঙ্গে চলতে হলে সরল অবিশ্বাসও অনেক সময় বেশি কাজ দেয়।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মৈত্র মশায় বললেন, 'বুঝলে ব্রাদার, মনটা কিন্তু আমার বড্ড খুঁতখুঁত করছে। জোর করে তোমরা আজ তের তারিখ জেনেও টিকিটটা কাটলে। সত্যিই কিন্তু তেরর মধ্যে অপয়া ব্যাপারটা আছে। যতই

নাস্তিক হও ব্রাদার, ওই বইটা যদি আনতে পারতুম—'

'কি বই ?'

'দারুন ব্যাপার। হেবো নিয়ে এসেছিল কাল কার কাছ থেকে চেয়েচিন্তে। খুব কস্টলি—পাওয়াও যায় না। একটা বিদেশী ম্যাগাজিন।'

মৈত্র বাবুর ভাইপোটির নাম কেন যে হেবো রাখা হয়েছিল জানি না। বুদ্ধির তো ঘাটতি নেই।

'কি নাম ম্যাগাজিনটার ?' প্রসাদ জানতে চাইলো।

'ওমেগা। নাম শুনেছ ?'

'না।'

'তা শুনবে কেন। শুধু নাস্তিকতার চর্চা। হেঁজিপেঁজি ব্যাপার নয় হে ! অস্টেলিয়া থেকে বেরোয়। যেমন ছাপা তেমনি কাগজ। আরে—হাসছ কেন ?'

প্রসাদ হাসি না চেপেই বললো, 'ভালো কাগজে ভালো ছেপে কত বিলিতি কাগজ ভালো ভালো ডাহা-ডাহা মিথ্যে কথা বলে জানেন ?'

'এই তো, না শুনেই আরম্ভ করে দিলে !'

আমি জানতুম অটল বিশ্বাসকে সামান্য যুক্তি দিয়ে নড়াতে পারবেনা প্রসাদ। মৈত্রমশায় আবার শুরু করলেন, 'ওই কাগজেই অ্যাটলান্টিক জাহাজডুবির কথা পড়লুম। অ্যাটলান্টিক নামে একটা বিরাট জাহাজ ছিল, জানো তো তোমরা ? বহুকাল আগের কথা। 1873 সাল। অ্যাটলান্টিক লিভারপুল বন্দর ছাড়লো বিশে মার্চ। আর ডুবলো পয়লা এপ্রিল। তার মানে ঠিক তের দিন পরে—তের দিন। শুধু কি তাই ? লিভারপুল থেকে জাহাজ ছাড়ার পর একদিন খাবার-টেবিলে তের জন লোক বসেছিল। কয়েকজন তখন আপত্তিও করেছিল কিন্তু কেউ সেকথা কানে তোলেনি। জানো নিশ্চয় বিলেতে 13 নম্বরের কোন বাড়ি হয়না, 13 নম্বর বাস রুট নেই...'

আমরা কোন প্রতিবাদ না করায় মৈত্র মশায়কে থামতে হলো। ওনার গুণধর ভাইপোটি সম্বন্ধে যেটুকু খবর পেয়েছি তার সামান্য একটুও যদি বিশ্বাস করাতে পারতুম...আজ এই তের তারিখে ট্রেনের টিকিট কাটা নিয়েও ঝামেলা পাকিয়েছিল হেবো। তার জেঠার পক্ষে তেরটা নাকি খুব অশুভ—তের সংক্রান্ত কোন কিছুর মধ্যে থাকা উচিত নয়।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মৈত্র মশায় এবার তাড়া লাগালেন, 'কই হে, তোমাদের তো কিছুই গোছগাছ হয়নি।'

সময় হয়ে এলো মানে এখনো চার ঘণ্টা সাতাশ মিনিট বাকি। মৈত্র মশায়ের হিসাব মতো ট্রেন ছাড়ার এক ঘণ্টা আগে বেরলেই চলে, কিন্তু রাস্তাঘাটের অবস্থার জন্যেই আরো একঘণ্টা হাতে রাখা দরকার। তাছাড়া অফিস ছুটির সময়ের কথা খেয়াল রেখে আরো একঘণ্টা...

তা-না-না-না করে সাড়ে চারটার বাজিয়ে নিচে নামলো প্রসাদ। মৈত্র মশায় ঘণ্টা খানেক ধরে পায়চারি করছেন রাস্তায়, মিনিট পাঁচেক অন্তর হাঁক পাড়ছেন, 'আজ ট্রেন ফেল হবেই। হবেই হবে ! না হয়ে উপায় আছে ! তখনই বলেছিলাম তের তারিখের টিকিট কেট না। কাণ্ড দ্যাখো, এক ঘণ্টার মধ্যে একটা ট্যাক্সির মুখ দেখলুম না।'

কিট্‌ব্যাগ কাঁধে নেমে এসে প্রসাদ বললো, 'এত সরু গলিতে ট্যাক্সি খুব কমই ঢোকে। আমি ধরে আনছি।'

বলতে না বলতেই ট্যাক্সির আবির্ভাব। যাকে বলে দেবদূতের মতো !

'এখনো আপনি তের তারিখকে অপয়া বলবেন ?' আমি একটা হ্যাভারস্যাক তুলে নিয়ে বললুম। মৈত্র মশায় তুলেছেন আরেকটা। লাগেজ ক্যারিয়ারের ডালাটা তুলবে বলে ট্যাক্সি ড্রাইভার নেমে এসেছে। হঠাৎ মৈত্র মশায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'প্রসাদ ! ট্যাক্সিটা ছেড়ে দাও !'

চমকে গেলাম। বলেন কি ?

'আমি বলছি পয়সা দিয়ে দাও। আমি এতে উঠব না।'

প্রসাদ কোন কথা না বলে ততক্ষণে চড়ে বসেছে।

মৈত্র মশায় প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ছেন, 'সর্বনাশ হবে আজ ! কপালে হেভি দুর্ভোগ। কি সাংঘাতিক কাণ্ড—WBT 13 ! ট্যাক্সির নম্বর তের ! না না ! এ হয়না।'

ট্যাক্সির নাম্বার প্লেটের দিকে তাকিয়ে আমাকেও অবাক হতে হল। নিশ্চয় প্রসাদের কারসাজি।

একরকম টেনেটুনেই মৈত্রমশায়কে তোলা হল ট্যাক্সিতে। এখন তের দেখে ট্যাক্সি ত্যাগ করা মানে নির্ঘাৎ ট্রেন ফেল্। তবু একটা চান্স তো নেওয়া যাবে।

মৈত্র মশায় সমানে গজগজ করছেন, 'ট্রেন ফেলের চেয়ে এখন বড় কিছু ফেল্ হয় কিনা দ্যাখো।'

ব্র্যাবোর্ণ রোডে পড়ার পর WBT 13 হঠাৎ ল্যাঙচাতে ল্যাঙচাতে ফুটপাতের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লো। আড়চোখে প্রসাদের দিকে তাকালাম। টায়ার পাংচার হওয়ার পিছনে নিশ্চয় প্রসাদের হাত নেই।

হাহাকার করে উঠলেন মৈত্র মশায়, 'এবার কি বলবে শুনি ?'

ড্রাইভার জ্যাকে ডাণ্ডায় প্যাঁচ লাগাতে লাগাতে বললো, 'ঘাবড়াইয়ে মত্ ! পাঁচ মিনট্‌কা কাম্ !'

প্রসাদ বলছে, 'স্টেপ্‌নি লাগিয়েও আমরা পনের মিনিট আগে স্টেশনে পৌঁছে যাব।'

প্রসাদ হাঁটু গেড়ে চাকা লাগানোর কাজে

'আর স্টেশান!' 'মৈত্র মশায় একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

এখন বুঝতে পারছি এই রকম কাকতালীয় যোগাযোগের কল্যাণেই 13 সংখ্যাটির ঘাড়ে দুর্নামের বোঝা চড়ানো সম্ভব হয়েছে। প্রসাদও হাঁটু গেড়ে চাকা লাগানোর কাজে সাহায্য করার ইচ্ছে প্রকাশ করছে।

মৈত্র মশায়ের সেদিকে দৃষ্টি নেই। তিনি আমাকে অ্যাপোলো মিশনের দুর্ঘটনার গল্প শোনাচ্ছেন। নাসা অর্থাৎ মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বিজ্ঞজনের উপদেশ না শুনে 13 নম্বর অ্যাপেলো মিশন ছেড়েছিল 1970-এর এপ্রিল মাসে ঠিক ঘটিকা 13 মিনিটে। ছাড়া হয়েছিল রকেট উৎক্ষেপণকারী 39 নম্বর প্যাড থেকে। বলাই বাহুল্য 13-র তিন গুণ 39। তিন জন মহাকাশচারী ছিল রকেটে—জেমস, ফ্রেড ও জন। ইংরেজিতে লিখলে—JAMES, FRED, JOHN। এই তিনটি নামের অক্ষরের সংখ্যা 13। অশুভ তেরকে নিয়ে এরকম ইয়ার্কি কি চলতে পারে? 13 এপ্রিল অ্যাপেলোর একটি অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ফেটে গেল। অভিযান পরিত্যক্ত।

চাকা পাল্টেও আমরা কুড়ি মিনিট আগে স্টেশনে পৌঁছেছি। প্ল্যাটফর্মটা জেনে নেওয়ার জন্যে ট্রেনের আগমন ও প্রস্থানের সময়সূচী লেখা বোর্ডের কাছে এসে মুখ তুলে তাকালুম। স্টীল এক্সপ্রেসের নাম চোখে পড়লো, কিন্তু প্ল্যাটফর্ম নম্বর দেখার আগেই মৈত্র মশায়ের দিকে আবার তাকাতে হলো। তাঁরও দৃষ্টি পড়েছে বুঝতে পারছি। নাঃ প্রসাদটা সত্যিই একটা কাণ্ড করেছে আজ। এত দিকে খেয়াল রেখে টিকিট কেটেছে! স্টীল এক্সপ্রেসের কোড্ নম্বর—13—সেই তের!

1 তারিখে WBT 13 ট্যাক্সি চেপে 13 Up ট্রেন ধরে পাড়ি জোড়া! মৈত্র মশায়ের মুখে আর কথা নেই।

ট্রেনে উঠে জাঁকিয়ে বসার পরেও বুঝতে পারছিলুম মৈত্র মশায়ের অশান্তি এখনো ঘোচেনি। বুদ্ধি করে প্রসাদ চা-ওলাকে ডাকলো। মৈত্র মশায় চায়ের ভাঁড়ে সশব্দে চুমুক দিয়ে তবে স্বাভাবিক হলেন।

'ব্রাদার। ডেঞ্জারাস রসিকতা করেছ কিন্তু!'

পরিবেশ হালকা হয়ে এলে প্রসাদ মুখ টিপে হেসে বললো, 'তাও তো আপনি সবটা খেয়াল করেননি।'

'তার মানে? আরো কিছু মতলব এঁটেছ নাকি?'

খবরের কাগজটা বাঁ হাতে নিয়ে ডট পেন্‌টা বার করল প্রসাদ, 'এই দেখুন, আজকের তারিখটা লিখছি—13.1.80 কি বুঝতে পারছেন? তের-এক-আশির অঙ্কগুলো এক-এক করে যোগ দিয়ে দেখুন, কত হলো? এক, তিন, এক, আট আর শূন্য—যোগ দিলেই, হ্যাঁ, তের!'

'ওফ্! কী কাণ্ড! অ্যাঁ? এত ভেবেচিন্তে আজকের দিনটা সিলেক্ট করেছ? না না, এও একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট বই কি!' কাউকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে তাঁর কোন কার্পণ্য নেই।

'আরো আছে!' প্রসাদ বললো, 'এখন জানুয়ারি মাস। বছর—নাইন্টিন এইট্টি বা সংক্ষেপে আমরা বলি এইট্টি। এবার ইংরেজিতে লিখছি—JANUARY, EIGHTY। সবশুদ্ধ কটা অ্যালফাবেট হলো জানুয়ারিতে সাতটা আর এইট্টিতে ছ'টা।'

'আবার তের!' আমারই মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল। 'আরো কিছু আছে নাকি তেরোর খেল?'

প্রসাদ ইংরেজি হরফে লিখল—MONDAY। হ্যাঁ, আজ সোমবার। তারপর লিখল JANUARY। যোগ করতেই আবার তেরটি বর্ণ।

বন্যার মতো তেরোর এই অভাবনীয় আক্রমণে মৈত্র মশায় কিন্তু টলে যাননি, 'তোমার মগজের তারিফ করতে হচ্ছে ব্রাদার। কিন্তু আমাকে এইভাবে তেরোর গেরোর মুখে ফেলার একটা উল্টো বিপত্তির কথা কি ভেবেছ? হাসতে হাসতেই বললেন তিনি।

'কি রকম?'

'ধরো সত্যিই যদি তেমন কিছু ঘটে তা হলে? তের সম্বন্ধে আমার ভুল ধারণা তাড়াতে গিয়ে শেষে আবার সেটাই না…'

'হ্যাঁ তার কোনই সম্ভাবনা নেই তা নয়। এই তো ট্যাক্সির টায়ার পাংচার হলো। কিন্তু তবু রিস্ক খুবই কম।

'দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।'

'শেষ পর্যন্ত বলে কিছু নেই। আমরা কোথায় দাঁড়িটানব তার ওপরেই নির্ভর করছে কোথায় শেষ হবে। 13 তারিখটা পেরোতে আর কতক্ষণ……'

প্রসাদকে বাধা দিলেন মৈত্র মশায়. 'উঁহু, তা নয়। তের তারিখ পেরলেই চলবেনা। নির্বিঘ্নে কলকাতায় ফিরে আসতে পারলে তবে ধরে নেব তেরর কোন অশুভ ক্ষমতা নেই। ঠিক আছে?'

'এগ্রিড্।'

79 ঘণ্টা 17 মিনিট বাদে তেরোর অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করে আমরা ফিরে এসেছি মেসে। মৈত্র মশায়কেও টেনে এনেছি চায়ের কথা বলে। সত্যি বলতে, এই পুরো সময়টা আমারই কেবল উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে। অথচ তেরকে নিয়ে দু'পক্ষের দু' সৈনিকের মধ্যে কোনো উদ্বেগ লক্ষ্য করিনি। প্রতি মুহূর্ত ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি। তটস্থ। রিক্সায় ওঠা, বাস ধরা, এমন কি দাড়ি কামানো নিয়েও কত রকম দুশ্চিন্তা যে ভিড় করেছিল মাথায়। দুর্ঘটনার কথা কেউ কি বলতে পারে! আর সেরকম কিছু ঘটলেই তো তের বাবাজী…নাঃ, বলবার মতো ঘটনা একটাই। ট্রেনে আমাদের কাঁচা গোল্লা খাওয়াতে গিয়ে মৈত্রমশায় আতিপাতি ক'রে খুঁজেও হ্যাভারস্যাকের চাবি খুঁজে পাননি। পকেটে শ'খানেক চাবি থাকা সত্ত্বেও একটাও লাগলো না। আমি তখন প্রমাদ গুনছি। মৈত্র মশায় এর পিছনে যদি অশুভ তেরকে খুঁজে পান· ·অবশ্য সেরকম কিছু ঘটেনি। মৈত্র মশায় স্বীকার করেছিলেন চাবি আনতে প্রায়ই তাঁর ভুল হয়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মৈত্র মশায় বললেন, 'তোমাদেরই জিত হলো ব্রাদার। তবে হ্যাঁ – এটা গ্লোরিয়াস ডিফিট। হেরে আমি খুশি। কিন্তু খুব রিস্ক নিয়েছিলে। দৈবাৎ একটা গড়বড় ঘটলে কিন্তু আমার কুসংস্কার আরো জাঁকিয়েই বসত।'

'বসত না! সেটাও ভেবে রেখেছিলাম।' প্রসাদ বলল।

'তার মানেটা কি দাঁড়াল?'

'তেমন কিছু ঘটলে প্রমাণ করে দিতাম জন্মলগ্ন থেকেই তের আপনার নিত্যসঙ্গী। হঠাৎ আজকে তেরকে অশুভ বলে দায়ী করার কোনো মানেই হয় না।'

'তুমি কি আমার ঠিকুজি-কুষ্ঠিও দেখেছ নাকি হে?'

'মোটেই না। এই কাগজটায় ইংরেজিতে আপনার নামটা লিখে ফেলুন তো—'

MANOJIT MAITRA—নাম লেখার পর আর জিজ্ঞেস করতে হয়নি। তেরোটা বর্ণ আছে।

প্রসাদ বললো, 'আপনার নামের সঙ্গে আরেক ভাবে জড়িয়ে আছে তের।'

'তাই নাকি?'

'আপনার নাম ও পদবী—দুয়েরই আদ্যক্ষর M। M ইংরেজি বর্ণমালার তের নম্বর স্থানে আছে।'

ঘর কাঁপিয়ে হাসলেন মৈত্র মশায়, 'সাবাশ!'

আমি বললুম, 'কিন্তু সবই তো ইংরিজি হিসাবে হল। বাংলা বানান নিয়ে –'

মৈত্র মশায় বাধা দিলেন, 'এটা তো বাংলার ব্যাপারই নয়। বিদেশী মানে ক্রিশ্চানদের একটা কিংবদন্তী থেকে 13-র বদনাম শুরু। লাস্ট সাপারে যিশুকে ধরে তের জন বসেছিলেন খাবার টেবিলে। সেদিনই বিষ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।'

'যাক—তাহলে এটা কি ধরে নিতে পারি যে এরপর আর বেনেপুকুরের তের নম্বর বাড়িটা আপনি ত্যাগ করবেন না?' প্রসাদের কথা যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।

আমি স্তম্ভিত। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন মৈত্র মশায়।

প্রসাদ বলল, 'ঘটনাচক্রে আপনার বাড়ির নম্বর তের বলেই আপনাকে উৎখাত করার জন্যে আপনার আপনজনেরা এইভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল তেরোর আতঙ্ক তৈরি করার জন্যে। ইংরেজিতে যাকে বলে ট্রিসকাইডেকাফোবিয়া। সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম বলেই এত আয়োজন। বুঝিয়ে বললে তো শুনতেন না।'

মৈত্র মশায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মাথা নিচু করে যেন আপন মনে বলতে শুরু করলেন, 'কোনো সন্দেহ যে হয়নি তা নয়। কিন্তু ওরা সেটা পরিষ্কার করে বললেই ভাল করত। সত্যিই তো ওইটুকু বাড়িতে ওদের কুলোয় না। তা ছাড়া হেবো যা রোজগার করে, সে কিছুই না। বেচারাদের উপায়ই বা কি! কিন্তু আমি তো এমনিতেই আবার দিশেরগড়ে ফিরে যাচ্ছি। একটা প্রাইভেট কম্পানিতে চাকরি পেয়েছি।'

মৈত্র মশায় সত্যিই চাকরি পেয়েছেন বলেই চলে যাচ্ছেন কিনা জানা সম্ভব নয়। চেপে ধরলে হয়তো আরোই বিব্রত হবেন। ভাইপোদের ব্যবহারে তাঁরই যেন মাথা হেঁট হয়েছে।

আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে আসলে বোধ হয় তের সম্বন্ধে তাঁর কোন ভয়ই ছিল না। আঙটির ব্যাপারও বোধহয় তাই। ভাইপোদের মুখ চেয়ে ও তাদের আড়াল করার জন্যেই হয়ত…

ফ্রেডারিক উইলিয়াম হার্শেল

(1738—1822)

বিবেক রায়

আদি নাম ফ্রেডারিক উইলহেল্ম হার্শেল। জন্ম জার্মানীর অন্তর্গত হ্যানোভার শহরে। পিতা আইজ্যাক হার্শেল হ্যানোভার শহরের এক বিখ্যাত কনসার্ট পার্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। আজীবন তিনি সুর সাধনাই করে গেছেন।

পিতা-মাতার অনেক গুণই পুত্রে বর্তায়। পুত্র ফ্রেডারিক উইলিয়াম হার্শেলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। যন্ত্রসঙ্গীতের মূর্ছনা বাল্যকালেই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। হ্যানোভারেই তিনি যন্ত্রসঙ্গীতের তালিম নেওয়া শুরু করেছিলেন। বাল্যের গণ্ডী পেরিয়ে উইলিয়াম হার্শেল যখন কৈশোরে পদার্পণ করলেন, তখন ঘটে গেল এক নিদারুণ পারিবারিক বিপর্যয়। পিতা আইজ্যাক হার্শেল মারা গেলেন। সংসারের দায়দায়িত্ব বর্তালো কিশোর ছেলেটির উপর।

1757 সালে হার্শেল চলে এলেন ইংলণ্ডে। জীবিকার্জনের তাগিদে যোগ দিলেন কনসার্ট পার্টিতে। এতদিন যা ছিল সাধনা ও অবসরবিনোদনের সুন্দর উপায়, এখন তা পরিণত হলো জীবিকার্জনের হাতিয়ারে। সে যাই হোক, ঐ বয়সেই তাঁর বাজনা শুনে সমঝদার সঙ্গীতজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেনঃ বড় হলে ছেলেটি খুব উঁচু

দরের যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী হবে। ওঁদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে ছিল। যৌবনকালে ফ্রেডারিক উইলিয়াম হার্শেল নিজেকে একজন খ্যাতনামা যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। কনসার্ট পার্টির অধিকর্তার পদও অলংকৃত করেছিলেন। যৌবনকালেই তিনি তাঁর সুরসাধনায় স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

একটা কথা বলা হয় নি।

সঙ্গীতজ্ঞরূপে কাজ করলেও অবসর সময়ে হার্শেল গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করতেন। ফারগুসন-এর 'অ্যাস্ট্রনমি' বইখানি পড়ে হঠাৎ একদিন হার্শেলের বাসনা হলো সৌরমণ্ডলকে চাক্ষুষ দেখার। কিন্তু খালি চোখে তো ভালভাবে দেখা সম্ভব নয়। ভালভাবে দেখতে হলে দরকার দূরবীন যন্ত্রের। সে যন্ত্রের দাম তখন অনেক। অত দাম দিয়ে দূরবীন যন্ত্রে কেনার সঙ্গতি ছিল না তাঁর। তিনি তাই নিজেই দূরবীন তৈরি করার কাজে হাত দিলেন।

ছোট বোন ক্যারোলিন লুক্রেশিয়া হার্শেল অল্প বয়স থেকেই দাদার সঙ্গীতসাধনার অংশীদার ছিলেন। নিজে সঙ্গীতচর্চা করতেন। দাদাকেও উৎসাহ দিতেন। এখন দাদার মতিগতির পরিবর্তন লক্ষ্য করে ক্যারোলিন বেশ অবাক হলেন! অবাক হবারই তো কথা। যন্ত্রসঙ্গীতে দাদার দারুণ সুনাম, রোজগারও নেহাৎ কম নয়। এমন সময় হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ আয়োজন ক্যারোলিনের কাছে কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকলো। তবুও দাদাকে মুখে তিনি কিছু বললেন না। বরাবরের মত এবারও দাদাকে তিনি উৎসাহ দিতে লাগলেন। তাঁর কাজে সহযোগিতাও করতে লাগলেন।

অবশেষে উইলিয়াম হার্শেল তাঁর নতুন প্রচেষ্টায় সফল হলেন। প্রথমে তৈরি করলেন দু ইঞ্চি ব্যাসের একটি সাধারণ দূরবীন। তাই দিয়েই শুরু করলেন আকাশ পর্যবেক্ষণ। কিন্তু তাতে সুবিধা না হওয়ায় পরে ছ ফিট ফোকাস দূরত্বের একটা বড় দূরবীন তৈরি করে ফেললেন। ঐ দূরবীনের সাহায্যে 1781 সালে তিনি 'ইউরেনাস' নামক একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন।

সুরসাধক উইলিয়াম হার্শেল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন। তাঁর আবিষ্কারের খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্বে।

পরের বছর অর্থাৎ 1782 খ্রীষ্টাব্দে হার্শেল রাজা তৃতীয় জর্জের 'রাজজ্যোতিষী' নিযুক্ত হলেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন। তখনকার দিন পর্যন্ত শনিগ্রহের মাত্র পাঁচটি উপগ্রহের কথা বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। হার্শেল শনির আরও দু'টি উপগ্রহ আবিষ্কার করলেন। গ্রহ ও উপগ্রহদের ঘূর্ণন নিয়েও গবেষণা করতে লাগলেন। এরপর তিনি চার ফিট ব্যাস এবং চল্লিশ ফিট ফোকাস দূরত্বের একটি বড় দূরবীন তৈরি করে আকাশ পর্যবেক্ষণের কাজ চালাতে লাগলেন। সন্ধান পেলেন বহু যুগ্ম-তারা ও নীহারিকার। তাঁর দূরবীনেই প্রথম ধরা পড়লো ছায়াপথের প্রকৃত পরিচয়। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, বহু দূরের অসংখ্য তারা নিয়ে গঠিত হয় 'ছায়াপথ।' এটা লক্ষ্য করার পরই তিনি অনুমান করেন যে, নীহারিকাগুলি বহুদূরে অবস্থিত কতকগুলি নক্ষত্রজগৎ ভিন্ন আর কিছুই নয়। দীর্ঘকাল জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে উইলিয়াম হার্শেল এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সমগ্র সৌরজগৎ মহাকাশে একদিকে ছুটছে। যে বিন্দুর দিকে ছুটছে, হার্শেল তার অবস্থানেরও নির্দেশ দেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে উইলিয়াম হার্শেল রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে হার্শেলের অবদানের কথা বলতে গেলে আপনাআপনিই তাঁর ছোট বোন ক্যারোলিনের কথাও এসে পড়ে। কি সঙ্গীত-সাধনায়, কি জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় সর্বক্ষেত্রেই উইলিয়াম হার্শেলের কৃতিত্বের মূলে আছে এই নারীর অনন্যসাধারণ সহযোগিতা। ভাই-এর সঙ্গে কাজ করতে করতে ক্যারোলিনও হয়ে ওঠেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি আটটি ধূমকেতু ও তিনটি নীহারিকা আবিষ্কার ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

এই প্রখ্যাত ইংরেজ জ্যোতির্বিদ পরিণত বয়সে 1822 খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

খড়্গপুর, জেলা মেদিনীপুর

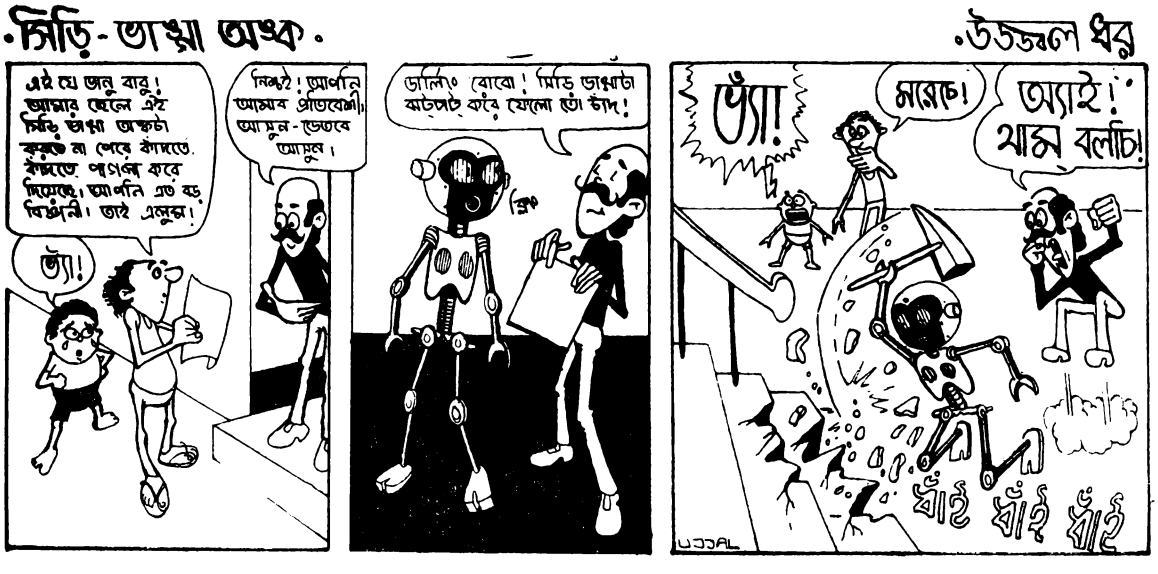

তাপ

অলক চক্রবর্তী

তাপ ঃ তাপ এক ধরনের শক্তি। এর কাজ করার ক্ষমতা আছে। তাপ প্রয়োগে বস্তু উষ্ণ হয়, তাপ অপসারণে শীতল হয়। তাপকে পদার্থের অভ্যন্তরের অণুগুলির গতিশক্তির আনুপাতিক এবং এর সঙ্গে জড়িত বলে মনে করা যেতে পারে।

তাপমাত্রা বা উষ্ণতা ঃ তাপমাত্রা বস্তুর এমন এক তাপীয় অবস্থা, যা কোনো বস্তু অপর কোনো বস্তুকে তাপ দেবে, না অপর কোনো বস্তু থেকে তাপগ্রহণ করবে, তা নির্দেশ করে।

নিম্নস্থিরাঙ্ক ঃ প্রমাণ চাপে বরফের গলনাঙ্ক বা বিশুদ্ধ জলের গলনাঙ্ককে (থার্মোমিটারের) নিম্নস্থিরাঙ্ক বলা হয়। সেল্‌সিয়াস্ স্কেলে যেমন থার্মোমিটারের নিম্নস্থিরাঙ্ক O°C, ফারেনহাইট স্কেলে 32°F,

ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক ঃ বিশুদ্ধ জলের স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্ককে থার্মোমিটারের ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক বলা হয়। যেমন, সেলসিয়াস স্কেল অনুযায়ী থার্মোমিটারের ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক 100°C, ফারেনহাইট স্কেল অনুযায়ী 212°F

আপেক্ষিক তাপ ঃ কোনো পদার্থের একক ভরের তাপমাত্রা 1 ডিগ্রী বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, তাকে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বলে।

তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বা জুল তুল্যাঙ্ক ঃ একক তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ কাজ করা হয়, সেটাই হলো তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক (J), সি, জি, এস, পদ্ধতিতে

$$J = 4{,}2 \text{ জুল/ক্যালরি}$$
$$= 4{,}2 \times 10^7 \text{ আর্গ/ক্যালরি}$$

এফ, পি, এস, পদ্ধতিতে $J = 778$ ফুট-পাউণ্ড/ক্যালরি

প্রশ্নোত্তর

1. দুটি কেটলীতে সমভরের দুধ ও জল নিয়ে সমহারে তাদের উত্তপ্ত করলে দুধের উষ্ণতাবৃদ্ধির হার জলের চেয়ে বেশি হ'তে দেখা যায় কেন?

জলের আপেক্ষিক তাপ দুধের চেয়ে বেশি বলে জলের তাপমাত্রাবৃদ্ধি দুধের চেয়ে কম হয়, যদি তাদের সমভরকে সমান তাপ দেওয়া হয় তবেও।

2. কোনো গতিশীল বস্তু হঠাৎ বাধা পেয়ে থেমে গেলে তার তাপমাত্রা বেড়ে যায় কেন?

গতিশীল বস্তুটি বাধা পেয়ে হঠাৎ থেমে গেলে তার গতিশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। থামার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ঐ গতিশীল বস্তুটি তার গতির জন্যে যে কার্য করে তা সমতুল্য তাপে পর্যবসিত হয় এবং উৎপন্ন ঐ তাপই ঐ বস্তুর তাপমাত্রা বাড়ায়।

3. এক বালতি সাধারণ উষ্ণতার জলে একটা লোহিততপ্ত ছুঁচ ফেললে দেখা যায়, ছুঁচের তাপমাত্রা কমে যায়। অল্প তাপধারী ছুঁচ বালতির বেশি তাপ-ধারী জল থেকে তাপ নেওয়ার পরিবর্তে কেন তাপ বর্জন করে?

তাপের প্রবাহ সর্বদা উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুর দিকে হয়, মোট তাপের পরিমাণ বস্তু-গুলির যা-ই হোক্ না কেন। সেজন্যেই বালতির জলের মোট তাপ ঐ লোহিততপ্ত ছুঁচটির থেকে বেশি হলেও ছুঁচের তাপমাত্রা বেশি বলে ছুঁচই তাপ বর্জন করে। ফলে ছুঁচের তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

4. শীতকালে কাঠের চেয়ে স্টীলের চেয়ারে বেশি ঠাণ্ডা লাগে কেন?

স্টীলের তাপ পরিবহন ক্ষমতা কাঠের চেয়ে বেশি বলে স্টীল অপেক্ষাকৃত বেশি তাড়াতাড়ি আমাদের দেহ থেকে তাপ গ্রহণ করে। ফলে স্টীলের চেয়ারে অপেক্ষা-কৃত বেশি ঠাণ্ডা লাগে।

5. একটা লোহার দণ্ডের এক প্রান্ত ধরে অপরপ্রান্তে তাপ প্রয়োগ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে গরম লাগে কেন?

লোহা তাপের সুপরিবাহী। লোহার দণ্ডের একপ্রান্তে তাপ প্রয়োগ করলে পরিবহন প্রণালীতে তাপ খুবই তাড়াতাড়ি অপর প্রান্তকেও উত্তপ্ত করে দেয় ব'লে হাতে গরম লাগে।

6. হাতে হাত ঘোষলে হাত গরম হয় কেন?

হাতে হাত ঘষলে দুই হাতে ঘর্ষণের বিরুদ্ধে যে কার্য করা হয় তা সমতুল্য তাপে পরিণত হয়। ফলে হাত গরম হয়।

7, ফুটবল পাম্প করার সময় পাম্প গরম হ'য়ে ওঠে কেন?

ফুটবলের ব্লাডারের বায়ু বার হতে চায় ও পাম্পে চাপ দেয়। এই চাপের বিরুদ্ধে বায়ুর উপর কার্য করে পাম্প বায়ুকে ফুটবলের ব্লাডারের মধ্যে ঢুকায়। এই কার্য তাপে পর্যবসিত হয়ে বায়ু ও পাম্প উভয়কেই উত্তপ্ত

করে, তবে পাম্প ধাতুনির্মিত হয় বলে তা তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

8. পিতল ও লোহার রিবেট-করা পাত গরম করলে বেঁকে যায় কেন?

তাপ প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের প্রসারণ পৃথক হয়। কাজেই পিতল ও লোহা সমান তাপ প্রয়োগে অসমানভাবে প্রসারিত হয় বলে তাদের রিবেট-করা পাত বেঁকে যায়।

9. উলের পোশাক পরলে আমাদের গরম লাগে কেন?

উলের পোশাকের মধ্যে প্রচুর ফাঁকে বায়ু আবদ্ধ থাকে। বায়ু তাপের কুপরিবাহী বলে আমাদের দেহের তাপ বাইরে যেতে পারে না। ফলে আমাদের গরম বোধ হয়। (এই কারণেই শীতকালে উলের পোশাক ব্যবহার করা হয়)।

10. একজন নার্স ভুলক্রমে ডাক্তারী থার্মোমিটার পরিষ্কার করার জন্যে ফুটন্ত জলে ফেলে দিল। থার্মোমিটারের নল তাতে ফেটে গেল কেন?

ডাক্তারী থার্মোমিটারের অংশাঙ্কন সর্বাধিক 110°F পর্যন্ত থাকে (যেহেতু মানবদেহের তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি কখনই হতে পারে না)। কিন্তু ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা 212°F হয় বলে ফুটন্ত জলে ডাক্তারী থার্মোমিটার ডুবালে তার পারদসূত্র তাপ গ্রহণে অতিরিক্ত প্রসারিত হতে চায়। কিন্তু তার অতখানি প্রসারণের স্থান থাকে না বলে ঐ থার্মোমিটারের নলে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। ফলে ঐ নল ফেটে যায়।

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, জয়পুরিয়া কলেজ, কলি-5

নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য
ভৌতবিজ্ঞান (Physical Science)-এর সেরা বই
ডঃ অলক চক্রবর্ত্তী, ডি. এস. সি.
ও
অমিয়তোষ রায় লিখিত
বিজ্ঞান প্রবেশিকা
তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ
[সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও ব্যবহারিক অংশ সহ]
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ৩৪-৩১৫৭ * গ্রাম : গ্রন্থাগার

1983'র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর জন্য

ভৌত-বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

অমরনাথ রায়

[ক-বিভাগ]

1. (ক) তাপ ও উষ্ণতার মধ্যে প্রভেদ কি?

(খ) তামার আপেক্ষিক তাপ 0·09 বলিতে কি কি বুঝ?

(গ) 'ক্যালোরি' কিসের একক? উহার সংজ্ঞা কি?

(ঘ) $-40°C$ = কত ডিগ্রি ফারেনহাইট? অঙ্ক কষিয়া বাহির কর।

(ঙ) 'বরফ গলনের লীন তাপ 80 ক্যালোরি প্রতি গ্রামে' বলিতে কি বুঝ?

2. (ক) 'প্রেসার কুকার' কোন্ নীতিতে কাজ করে?

(খ) হাতে ইথার ঢালিলে ঠাণ্ডা বোধ হয় কেন? মাটির কলসীর জল ঠাণ্ডা হয় কেন?

(গ) তরলের স্ফুটনাংক চাপের উপর নির্ভরশীল, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য একটি পরীক্ষা উল্লেখ কর।

(ঘ) পরীক্ষা উল্লেখপূর্বক পুনঃশিলীভবন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

(ঙ) তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক বলিতে কি বুঝ?

3. (ক) চার্লস ও বয়েলের সূত্র লিখ।

(খ) অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্প কি? অ্যাভোগাড্রো সংখ্যার মান কত?

(গ) ভরের নিত্যতা সূত্রটি লিখ এবং উহা প্রমাণ করিবার জন্য একটি পরীক্ষা উল্লেখ কর।

(ঘ) ভর ও ভারের পার্থক্য লিখ। 36 কিগ্রা ওজনের একটি বস্তুকে চাঁদে লইয়া গেলে উহার ভর ও ভারের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিবে?

(ঙ) স্প্রিং তুলা, মাপক চোঙ ও স্টপওয়াচ-এর ব্যবহারগুলি লিখ।

4. (ক) সৌরজগৎ ও পরমাণুর গঠনের মধ্যে সাদৃশ্য কি, প্রভেদই বা কি?

(খ) আইসোটোপ কাহাকে বলে? আইসোটোপ সৃষ্টি হয় কেন? হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের আইসোটোপ-গুলির পরিচয় দাও।

(গ) পরমাণু ও আয়নের মধ্যে প্রভেদ কি? কি করিয়া পরমাণু আয়নে পরিণত হয়?

(ঘ) প্রোটনের তড়িৎ আধানের প্রকৃতি কিরূপ? উহা কি ইলেকট্রন অপেক্ষা ভারী? পরমাণুর নিউ-ক্লিয়াসের বাহিরে কোন্ কক্ষে কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

(ঙ) ইউরেনিয়াম মৌলের একটি আইসোটোপের ভর সংখ্যা 238 এবং পরমাণু ক্রমাংক 92.

একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা কত?

['খ' বিভাগ]

5. (ক) দ্রুতি ও বেগের মধ্যে পার্থক্য কি? নিউটনের গতিসূত্রগুলি লিখ।

(খ) ত্বরণ ও মন্দনের মধ্যে পার্থক্য কি? ত্বরণের এককের পার্শ্বে সেকেণ্ড কথাটি দুইবার লেখা হয় কেন? অভিকর্ষজাত ত্বরণের মান কত? পৃথিবীর সর্বত্র উহার মান কি স্থির?

(গ) বলের সংজ্ঞা কি? সি, জি, এস এবং এফ, পি, এস, পদ্ধতিতে বলের এককগুলি কি?

(ঘ) 'জাড্য' কাহাকে বলে? উহা কয় প্রকার ও কি কি? উদাহরণ দাও।

(ঙ) রকেটের কার্যপ্রণালী সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। উহার কার্যপ্রণালী নিউটনের কোন্ সূত্রের উপর নির্ভরশীল?

6. (ক) আনত তলে কোন বস্তু রাখিলে উহা গড়াইয়া নিচে নামিয়া আসিতে চাহে কেন?

(খ) 'অশ্বশক্তি' কাহাকে বলে? 'আলোক বর্ষ' কি?

(গ) লিভার কাহাকে বলে? নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর লিভার, তাহা কারণ উল্লেখ করিয়া লিখ।

কাঁচি, জাঁতি, মানুষের হাত, নৌকার দাঁড় ও চিমটা।

(ঘ) 25 গ্রাম ভরের একটি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করায় উহাতে 10 সেমি/সেকেণ্ড^2 ত্বরণ সৃষ্টি হইল। বলের মান কত?

(ঙ) একটি বালক 4 মিটার/সেকেণ্ড বেগে দৌড়াইতেছে। অতঃপর সে 2 মিটার/সেকেণ্ড^2 ত্বরণ লাভ করিল। 2 সেকেণ্ড পরে তাহার বেগ কত হইবে?

7. (ক) আলোকের প্রতিসরণ কাহাকে বলে? প্রতিসরণের সূত্র দুইটি লিখ ও চিত্র আঁকিয়া বুঝাও।

(গ) একটি চৌবাচ্চা জলপূর্ণ থাকিলে তাহার গভীরতা প্রকৃত গভীরতা অপেক্ষা কম বলিয়া বোধ হয় কেন তাহা চিত্র আঁকিয়া বুঝাও।

(ঘ) চিত্র আঁকিয়া সংকট কোণ ও আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ব্যাখ্যা কর।

(ঙ) উত্তল লেন্সকে বিবর্ধক কাচ হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে বস্তুকে কোথায় রাখিতে হয় এবং প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কিরূপ হয় তাহা লিখ।

8. (ক) বর্ণালী কাহাকে বলে? উহা কিভাবে গঠিত হয়? শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বর্ণালী বলিতে কি বুঝ?

(খ) শব্দের বেগ বায়ুতে কিভাবে নির্ণয় করা যায়? প্রতিধ্বনি কি? উহা কিভাবে সৃষ্টি হয়?

(গ) সুরযুক্ত শব্দের দুইটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

(ঘ) শব্দের প্রতিফলনের ব্যবহারিক প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত চিত্র সহযোগে বর্ণনা কর।

(ঙ) শ্রবণোত্তর তরঙ্গ কাহাকে বলে? উহার বিভিন্ন প্রয়োগ উল্লেখ কর।

9. (ক) এক্স রশ্মি ও ক্যাথোড রশ্মি, উভয়েরই দুইটি করিয়া ধর্ম লিখ। উভয় প্রকার রশ্মির প্রকৃতি কিরূপ? এক্স রশ্মির ব্যবহারিক প্রয়োগগুলি উল্লেখ কর।

(খ) তড়িৎচুম্বক কাহাকে বলে? উহার দুইটি ব্যবহার উল্লেখ কর।

(গ) রোধের সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

(ঘ) বার্লো চক্রের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

(ঙ) তড়িৎপ্রবাহ, বিভব ও রোধের একক কি কি?

10. (ক) ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়ম ও অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়ম লিখ।

(খ) ওহমের সূত্র লিখ।

(গ) তড়িৎ-চুম্বকের শক্তি কি উপায়ে বৃদ্ধি করা যায়?

(ঘ) পরিবাহীর রোধ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

(ঙ) বার্লো চক্রের ঘূর্ণনের উপর কি প্রভাব দেখা যায় যখন ঃ

(i) তড়িৎ-প্রবাহ মাত্রা বাড়ানো হয়।

(ii) তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ উল্টাইয়া দেওয়া হয়।

(iii) চুম্বকের মেরুদ্বয়ের অভিমুখ উল্টাইয়া দেওয়া হয়।

(iv) চুম্বককে সরাইয়া লওয়া হয়।

['গ' বিভাগ]

11. (ক) আধুনিক পর্যায়সূত্রটি লিখ। পর্যায়-সারণীর পর্যায় ও গ্রুপ কাহাকে বলে? হাইড্রোজেন, সোডিয়াম, ক্লোরিন ও আরগন পর্যায়-সারণীর কোন্ কোন্ গ্রুপে থাকে?

(খ) পর্যায়-সারণীর উপযোগিতা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

(গ) ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল কাহাদের বলে? উদাহরণ দাও।

(ঘ) আদর্শ মৌল কাহাদের বলে? উদাহরণ দাও।

(ঙ) উদাহরণ সহযোগে তড়িৎযোজ্যতা ও সমযোজ্যতা ব্যাখ্যা কর। নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি তড়িৎযোজী ও কোন্‌গুলি সমযোজী যৌগ তাহা লিখ।

(i) KCl (ii) HCl গ্যাস (iii) CO_2 (iv) H_2O (v) CH_4 (vi) $Mg(NO_3)_2$

12. (ক) উদাহরণ সহযোগে তাপমোচী ও তাপগ্রাহী বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

(খ) মোমবাতির জ্বলন এবং প্লাটিনাম তারের উত্তপ্তীকরণ কিরূপ পরিবর্তন তাহা কারণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

(গ) স্বাভাবিক উষ্ণতায় সংস্পর্শে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার একটি উদাহরণ দাও।

(ঘ) একটিমাত্র ভৌতধর্মের সাহায্যে কিরূপে কেরোসিন ও অ্যালকোহলকে সনাক্ত করিবে?

(ঙ) সাধারণ উষ্ণতায় কোন্ ধাতু তরল এবং কোন্ অধাতু তরল?

13. (ক) গন্ধক, বেঞ্জিন, চিনি, বালি, খড়িমাটি, হীরক, অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, ফসফরাস ও কার্বন—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি মৌলিক ও কোন্‌টি যৌগিক পদার্থ তাহা উল্লেখ কর।

(খ) 'ধাতুকল্প' কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(গ) বায়ু ও বারুদকে মিশ্র পদার্থ বলা হয় কেন?

(ঘ) কোন্ অধাতু খুব হাল্কা অথচ তড়িৎ-ধনাত্মক?

(ঙ) নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির সর্ববহিঃস্থ কক্ষে কয়টি ইলেকট্রন থাকে ?

14. (ক) ক্ষার ও ক্ষারকের মধ্যে প্রভেদ কি ? উদাহরণ দাও।

(খ) লবণ কিরূপে গঠিত হয় ? দুইটি প্রশম লবণের নাম ও আণবিক সংকেত লিখ।

(গ) প্রশমন ক্রিয়া কাহাকে বলে ? প্রশমন ক্রিয়ায় নির্দেশকের ভূমিকা কি ? ফিনপথ্যালিন নির্দেশকের বর্ণ অ্যাসিড দ্রবণে কিরূপ হয় ? ক্ষার দ্রবণে কিরূপ হয় ?

(ঘ) 'জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া একই সঙ্গে ঘটে' এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন কর।

(ঙ) অনুঘটক কাহাকে বলে ? পরীক্ষাগারে $KClO_3$ হইতে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুতকালে MnO_2 ব্যবহার করা হয় কেন ?

15. (ক) বহুরূপতা কাহাকে বলে ? কার্বন, সালফার ও ফসফরাসের রূপভেদগুলির নাম লিখ। প্রতিটি মৌলের দুইটি করিয়া ব্যবহার উল্লেখ কর।

(খ) দ্রাব্যতা কাহাকে বলে ? উষ্ণতার সহিত দ্রাব্যতার সম্পর্ক কি ?

(গ) $H_2 + Cl_2 = 2HCl$ রাসায়নিক সমীকরণটির তাৎপর্যগুলি লিখ। ঐ সমীকরণের অসম্পূর্ণতাগুলি উল্লেখ কর।

(ঘ) কিপ্ যন্ত্রে প্রস্তুত করা যায় এমন তিনটি গ্যাসের নাম লিখ। এই যন্ত্রে গ্যাস প্রস্তুত করার সুবিধা কি ?

(ঙ) সমীকরণ সহযোগে একটি জারণ ও একটি বিজারণ বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। দুইটি জারক এবং দুইটি বিজারক দ্রব্যের নাম লিখ।

16. (ক) পরীক্ষাগারে কিরূপে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয় ? ঐ অ্যাসিডকে কোন্ পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত-ভাবে সনাক্ত করা যায় ? 'অম্লরাজ' কাহাকে বলে ? গাঢ় HNO_3-কে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিলে কি হয়, সমীকরণ সহযোগে লিখ।

(খ) কিভাবে প্রমাণ করিবে—

(i) অ্যামোনিয়া জলে অতি মাত্রায় দ্রাব্য এবং উহার জলীয় দ্রবণ ক্ষারধর্মী (ii) HCl গ্যাস জলে অতি মাত্রায় দ্রাব্য এবং উহার জলীয় দ্রবণ অম্লধর্মী ?

(গ) কিরূপে প্রমাণ করিবে যে গাঢ় H_2SO_4 একটি তীব্র জলাকর্ষী পদার্থ ? গাঢ় H_2SO_4-কে তীব্র-ভাবে উত্তপ্ত করিলে কি হয় ? গাঢ় H_2SO_4-এর সহিত কার্বন, সালফার, কপার, সোডিয়াম ক্লোরাইড ও চিনির জলীয় দ্রবণের বিক্রিয়া সমীকরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) পরীক্ষাগারে কিরূপে শুষ্ক অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত করা হয় ? ঐ গ্যাসটিকে গাঢ় H_2SO_4 অথবা P_2O_5 দ্বারা শুষ্ক করা যায় না কেন ? কিভাবে ঐ গ্যাসকে সনাক্ত করা হয় ?

(ঙ) নিম্নলিখিত পদার্থগুলি প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও দুইটি করিয়া ব্যবহার লিখ ঃ

গ্লুকোজ, ফেনল, গ্লিসারল, অ্যাসিটিলিন ও ইথাইল অ্যালকোহল।

17. (ক) তুঁতে, ব্লিচিং পাউডার, অ্যামোনিয়াম সালফেট, কপার সালফেট ও কস্টিক সোডা—প্রত্যেকটির একটি করিয়া ব্যবহার উল্লেখ কর।

(খ) তামা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম ও লোহার দুইটি করিয়া আকরিকের নাম ও সংকেত লিখ। 'ধাতুসংকর' কাহাকে বলে ? চারিটি ধাতু সঙ্করের নাম, উপাদান ও ব্যবহার লিখ।

(গ) জৈব ও অজৈব যৌগের পার্থক্য লিখ। একটি সংপৃক্ত ও একটি অসংপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের নাম ও গঠন সংকেত লিখ। এক বন্ধন, দ্বি-বন্ধন ও ত্রি-বন্ধনযুক্ত জৈব যৌগের একটি করিয়া উদাহরণ দাও ও গঠনসংকেত লিখ। ফেনল, মিথাইল অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্ম ও বেঞ্জিনের গঠনসংকেত লিখ।

(ঘ) রেকটিফায়েড ও মেথিলেটেড স্পিরিটের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(ঙ) Na এবং Na^+ এর মধ্যে পার্থক্য কি ? H_2 এবং 2H এর মধ্যে পার্থক্য কি ?

18. (ক) 'তড়িৎ লেপন' কাহাকে বলে ? লোহার চামচেতে রূপার প্রলেপ কিভাবে দেওয়া যায় ?

(খ) এক মোল অক্সিজেনের ওজন কত ? প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় এক মোল অক্সিজেনের আয়তন কত ?

(গ) 64 গ্রাম SO_2 পাইতে হইলে কত গ্রাম তামার সহিত গাঢ় H_2SO_4-এর বিক্রিয়া ঘটাইতে হইবে ?
$(Cu = 63 \cdot 5,\ S = 32,\ O = 16)$

(ঘ) 10 কেজি চুনাপাথর হইতে কত পরিমাণ চুন পাওয়া যাইবে ? $(Ca = 40,\ C = 12)$

(ঙ) 130·8 গ্রাম দস্তা লঘু H_2SO_4-এর সহিত বিক্রিয়া করিলে কত গ্রাম H_2 উৎপন্ন হইবে ?
$(Z = 65 \cdot 4)$

এক অণু H_2SO_4-এর আণবিক গুরুত্ব কত ?

1983'র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

ঐচ্ছিক পদার্থবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

শৈলেশকুমার দত্ত

বিভাগ (ক)

1. নিউটনের গতি সূত্রগুলি লিখ। ডাইন ও পাউণ্ডালের সংজ্ঞা দাও।

2. ত্বরণ ও ভরবেগ কাহাকে বলে? সি জি এস পদ্ধতিতে উহাদের এককগুলি কি কি?

3. আর্কিমিডিসের সূত্রটি কি? উহা পরীক্ষা দ্বারা কিভাবে প্রমাণ করিবে?

4. পাস্কালের সূত্রটি লিখ। পরিষ্কার চিত্রসহ একটি হাইড্রোলিক প্রেসের বর্ণনা দাও।

5. সাইফন কাহাকে বলে? ইহার কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা কর।

6. (a) দ্রুতি ও বেগের পার্থক্য কি কি?

(b) ভর ও ওজনের পার্থক্যগুলি লিখ।

7. প্রমাণ কর $S = ut + \frac{1}{2}ft^2$

বিভাগ (খ)

8. (a) তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

(b) একটি ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারের নির্মাণ-প্রণালী বর্ণনা কর।

9. (a) স্ফুটন ও বাষ্পীভবনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। উহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

(b) জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণের ব্যাখ্যা দাও।

10. (a) গ্যাসের সূত্র দুইটি বিবৃত কর এবং সংযুক্ত সূত্র একটি সমীকরণের দ্বারা প্রমাণ কর।

(b) উষ্ণতার চরম স্কেল ও চরম শূন্য কাহাকে বলে?

(c) গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব দেখাইবার জন্য দুইটি সহজ পরীক্ষার বর্ণনা দাও।

(d) সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত বাষ্পের মধ্যে পার্থক্য কি?

বিভাগ (গ)

11. (a) আলোকের প্রতিসরণের সূত্রগুলি বিবৃত কর। উহাদের কিভাবে প্রমাণ করিবে?

(b) আলোকের প্রতিফলনের সর্তগুলি কি কি? ইহার একটি উদাহরণ দাও।

(c) আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের সর্তগুলি কি কি? উহার একটি উদাহরণ দাও।

12. (a) সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কিভাবে হয় বুঝাইয়া বল।

(b) প্রতি অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্র-গ্রহণ হয় না কেন?

13. (a) কৃত্রিম উপায়ে চুম্বকনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

(b) "আর্কচাপের পূর্বে আবেশ"—বুঝাও।

(c) সংজ্ঞা দাও চৌম্বক আবেশ, চৌম্বক মধ্যতল এবং চৌম্বক ভ্রামক।

(d) তোমাকে সম্পূর্ণ সদৃশ তিনটি দণ্ড দেওয়া হইল। তন্মধ্যে একটি চৌম্বক পদার্থ এবং তৃতীয়টি একটি চুম্বক। অন্যকিছু ব্যবহার না করিয়া উহাদিগকে কিভাবে চিনিবে?

(e) চুম্বকত্বের আণবিকতত্ত্ব অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়টি বুঝাও।

(f) চুম্বকন দুইটি সমান ও বিপরীত মেরু সৃষ্টি করে?

14. (a) সরল তড়িৎ কোষের বর্ণনা দাও। উহার ত্রুটিগুলি কি কি? উহাদের কিভাবে দূর করা যায়? উহার ত্রুটিগুলি লেকল্যান্স সেলে কিভাবে বিদূরিত হয়?

(b) তড়িৎপ্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া দেখাইবার জন্য একটি পরীক্ষার বর্ণনা দাও।

(c) বৈদ্যুতিক ফিলামেণ্ট বাতির গঠন বর্ণনা কর।

(d) তড়িচ্চালক বল এবং বিভব বৈষম্যের পার্থক্য দেখাও।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর

15. (a) বার্লোর চক্র।

(b) বজ্রনিবারক।

(c) গ্যালভ্যানোমিটার

(d) বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

(e) জুলের সূত্রগুলি এবং তাহাদের পরীক্ষামূলক প্রমাণ।

1983-র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

অঙ্কের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে

নন্দলাল মাইতি

মাধ্যমিক পরীক্ষা আসন্নপ্রায়। আর মাত্র এক মাস বাকি। ইতিমধ্যে পরীক্ষার্থীরা যে যার যথাসাধ্য প্রস্তুতি সমাধা করে ফেলেছে সন্দেহ নেই। এখন চলছে নির্বাচনের পালা—কিছু কিছু প্রশ্নের নির্বাচন। সঠিক নির্বাচন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আবার নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি, অসতর্কতা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ নজর দিলে নম্বর বাড়ে, অধিকতর সাফল্য আসে। গণিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলে নম্বর বাড়ানো যায়, এ-বিষয়ে অতি সংক্ষেপে দু-চার কথা বলা যাক্।

সাধারণভাবে অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর কাছে গণিত ভয়ের বিষয়। ভয় করলেই ভয় বাড়ে, আর সব গুলিয়ে দেয়। তাই গণিতকে ভয় না করে আত্মবিশ্বাস দিয়ে পরীক্ষার হলে সব প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হয়। জানা বা সহজ প্রশ্নে উল্লসিত হতে নেই, আবার অজানা বা কঠিন প্রশ্নে হতবিহ্বল হতে নেই। ধীর স্থির হয়ে কোন্ অঙ্কটি প্রথম করা যায় নির্বাচন করতে হয়। প্রথম অঙ্কটি হলেই কিন্তু আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। বীজগণিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি যার যে অঙ্ক বা সমস্যা করতে ভাল লাগে, সহজ মনে হয়, সে সেইটি ধরলেই ভালো।

পাটীগণিতে অনুপাত ও সমানুপাত, শতকরা, লাভ ক্ষতি ও সুদকষা থেকে প্রতি বছর তিনটি অঙ্ক আসে। তার মধ্যে দুটি অঙ্ক কষতে হয়। সাধারণত অনুপাত ও সমানুপাত ও সুদকষা সম্পর্কিত অঙ্কগুলি তেমন জটিল নয়। বিশেষ করে সুদকষা অঙ্ক তো শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই শিখে আসে, আর নানা ধরনের অঙ্ক কষে বলে এই অঙ্কটি অনেকেই পারে। মিশ্রণ ও সম্ভুয়-সমুত্থান সম্পর্কিত অঙ্কগুলি একটু বেশি অনুশীলন করলে, এই অঙ্কটি কষা তেমন কঠিন নয়। তবে সমানুপাতের সূত্রগুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

পরিমিতি বিভাগে সূত্র অবশ্যই মনে রাখতে হবে। ক্ষেত্রফলের অঙ্ক ষষ্ঠ শ্রেণীতেই কষতে হয়, আর ত্রিভুজ ও বৃত্ত এবং চোঙ ও গোলক সম্পর্কিত সূত্রগুলি মনে রাখতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, এই 8 নম্বরের অঙ্কে জটিলতা কম, কেবল সূত্রের প্রয়োগ আর সমাধান করতে পারা মাত্র। এই একমাস এই অঙ্কগুলি অনুশীলন করলে নিশ্চিত সাফল্য আসবে।

বীজগণিতে উৎপাদকের সঙ্গে ল. সা. গু বা গ. সা. গু-র অথবা থাকে। এখানে 6 নম্বর পাওয়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। একমাত্র ত্রিঘাত রাশির উৎপাদক ছাড়া অন্য-গুলি তো সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতেই করতে হয়। 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে'র পাঠক-পাঠিকারা ইতিমধ্যে উৎপাদক নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের নিয়মের সঙ্গে সেইসব নিয়ম মিলিয়ে-মিশিয়ে অনুশীলন করলে উৎপাদক বিশ্লেষণ বা গ. সা. গু. নির্ণয় থেকে 6 নম্বর নিশ্চিত আসবে। গ. সা. গু. বা ল. সা. গু. নির্ণয়ের সময় সঠিক উত্তর লিখতে হবে। উত্তরে ভুল হলে কিন্তু নম্বর দেওয়া হয় না। গ. সা. গু. ভাগ করে করাই সবচেয়ে সহজ বলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা মনে করে। উৎপাদক বিশ্লেষণেও সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করতে হবে, আংশিক করলে নম্বর দেওয়া হবে না।

সমীকরণ সমাধান থেকে 6 নম্বর অনেকেই পায়। সহসমীকরণ প্রতি বছর আসে। সুতরাং এটির সমাধান থেকে 3 নম্বর অবশ্যই আসবে। মনে রাখা দরকার যে, x ও y-এর একটির মান নির্ণয় করলে চলবে না, দুটির মান নির্ণয় করতে না পারলে নম্বর পাবে না। দ্বিঘাত রাশির সমাধান খুবই সহজ থাকে, যদিও কখনো কখনো সহগগুলি বেশ বড় সংখ্যার হয়। এখানেও অজ্ঞাত রাশির দুটি মান অবশ্যই বার করতে হবে—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। নবম শ্রেণীর একঘাত রাশির সমাধানে পনেরো-কুড়িটা অঙ্কের অভ্যাস করলে এ-ধরনের সমাধান অনায়াসে করা যায়।

সমীকরণ ও অসমীকরণের লেখ দুটি থেকে 13 নম্বরতুলে নেওয়ার কথা সব পরীক্ষার্থীই চিন্তা করে। এখানে ভাগ ভাগ করে নম্বর দেওয়া হয়। তাই অক্ষ দুটি, মূলবিন্দু, ছক কাগজের এককের উল্লেখ করতে ভুললে চলবে না। তিন জোড়া বিন্দু অবশ্যই নিতে হবে। এ-বিষয়ে অসীম মুখোপাধ্যায় গত বছর মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন। পরীক্ষার্থীরা যেন 1982-র ফেব্রুয়ারীর কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান সংখ্যাটি দেখে নেয়। হ্যাঁ,—যারা অঙ্কে একটু ভাল বা করণী দেখে ভয় পায় না, তারা নিশ্চয় করণীর অঙ্কটি কষবে। দশ থেকে পনেরোটি অঙ্ক কষলেই এ ধরনের অঙ্ক কষা যায় শুধু—হরনিরসনের কৌশলটুকু রপ্ত করে নিতে হয় মাত্র।

মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের শেষে একটি বিভাগে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও পরিমিতি সংক্রান্ত

খুব সহজ প্রশ্ন থাকে। পাটীগণিতের অঙ্ক ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর মানের, *বীজগণিতের অঙ্ক সপ্তম-অষ্টম-ও* নবম শ্রেণীর একেবারে গোড়ার দিক থেকে আসে। দেখাও যে, প্রমাণ কর ইত্যাদি অঙ্কগুলিতে কেবল সূত্রের প্রয়োগমাত্র। এই বিভাগ থেকে 7 নম্বর পাওয়া কঠিন নয়।

ইতিমধ্যে জানুয়ারী 83 সংখ্যায় অসীম মুখোপাধ্যায় সম্পাদ্য সম্পর্কে বলেছেন। তাঁর কথাগুলি মনে রাখলে পরীক্ষার্থীরা অনায়াসে 8 নম্বর পেতে পারে আর বেশির ভাগ পরীক্ষার্থীই তা পায়। উপপাদ্যের প্রমাণে পূর্বেরটির সঙ্গে পরেরটির সম্বন্ধ আছে—মালার মত গেঁথে আছে। তাই এই একমাসে কয়েকটি নির্বাচন করে ছবি এঁকে অনুশীলন করলে অন্তত একটি হবেই। এমন কি একটিও না পারলে পরীক্ষার্থীরা যেন খাতায় ছবিটুকু এঁকে আসে। তাতে 3 নম্বর আসবে।

বস্তুমুখী গণিত অংশে পাটীগণিতে ঊর্ধ্ব ক্রমে—অধঃ-ক্রমে সাজাও, সরল করে মান বার কর, শতকরার খুব সহজ সহজ অঙ্ক থাকে যা মুখে মুখে করা যায়। আর বীজগণিতে অসমীকরণের সমাধান সেট নির্ণয় প্রতি বছর আসে, বিনিময়, সংযোগ, বিচ্ছেদ ও বন্টনী নিয়ম থেকে আসতে পারে, নিয়ন্ত্রিত সংখ্যার ধর্ম নিয়েও প্রশ্ন আসতে পারে। প্রথমটি ছাড়া শেষেরগুলি সপ্তম মানের। জ্যামিতিতে কখন ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব, বহুভুজের বাহুসংখ্যা, অন্তঃকোণের সমষ্টি সংক্রান্ত প্রশ্ন পড়তে দেখা যায়। এখান থেকে সাত-আট নম্বর পাওয়া খুবই সহজ—কেবল টেস্ট পেপার দেখে অনুশীলন করলেই হবে।

গণিতে কোন্ কোন্ অঙ্কগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ এবং কি কি সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করলে বেশি নম্বর পাওয়া যায়, সে-সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এখন কোন্ বিষয় থেকে কত নম্বর পাওয়া যায়, তার একটা হিসাব দেওয়া যাক।

পাটীগণিত—	7
বীজগণিত—	27
জ্যামিতি—	14
বস্তুমুখী গণিত—	7
	55

অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এই 55 নম্বরের মধ্যে সাধারণ পরীক্ষার্থীরা অনেকেই 50/52 নম্বর পায়। কিন্তু সবই নির্ভর করছে আত্মবিশ্বাস ও অনুশীলনের উপর। বলা বাহুল্য, গণিতে Suggestion হয় না—বিশেষ বিশেষ ধরনের অঙ্কের ইঙ্গিত দেওয়া যায় মাত্র। আমরা এখানে গণিতে সাফল্যের ও প্রস্তুতির একটা রূপরেখা তুলে ধরেছি মাত্র।

ঠাকুরানীচক, হুগলী

তোমরা কি জানো ?

তোমাদের জন্য তিনটে বাঘা বাঘা বই আমরা প্রকাশ করেছি। তার মধ্যে প্রথমটা হলো :

আবিষ্কারের পিছনে ১৬৲

ডাঃ মনীশ প্রধান

ভূমিকা লিখেছেন সমরজিৎ কর

তোমরা তো জানো, অসুখ করলে আমরা ওষুধ খাই, ইনজেকশন নিয়ে থাকি, কিন্তু কি ভাবে এতসব আবিষ্কার হলো তা হয়তো জানো না, ডাক্তারী শাস্ত্রের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আবিষ্কারের নানান কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক—যা কিন্তু গল্প নয় মোটেই, সত্যি। সোজা কথায় তোমাদের জন্য অসাধারণ একটি বই।

আমাদের দু নম্বর বইটি হলো

বিজ্ঞানের হরেকরকম ৭৲

অনীশ দেব

এতে আছে : মাপ কি করে এলো, পশুপক্ষীর শরীরে তাপ কিভাবে তৈরী হয়, বুদ্ধি কি করে মাপে, পৃথিবী কেমন দেখতে বা টিভিতে যা দেখা যায় না, এসব আশ্চর্য কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে সরস আলোচনা। এগুলো নিশ্চয় তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে। এসব বিষয় ছাড়াও প্রতি পাতায় মজার মজার ছবি উপহার দিয়েছেন লেখক নিজেই।

তিন নম্বর বইটিও কিন্তু প্রথম দুটোর চেয়ে কম নয়! এতে আছে ঘড়ি ও সময় মাপা নিয়ে নানান অজানা কথা

ঘড়ি নিয়ে রূপকথা ৭৲

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

আদিম মানুষ কি করে সময় মাপতে শিখলো, কি ভাবে আবিষ্কার হলো ছায়াঘড়ি, সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি। এছাড়া ইলেকট্রনিক ঘড়ি, পারমাণবিক ঘড়ি তো আছেই। সব মিলিয়ে এ এক মজার বই। সঙ্গে অনেক ছবি ও দুটো ফটোগ্রাফ।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

যে যে বইটা হাতে পেতে চাও পাঁচ টাকা অগ্রিম সহ নিচের ঠিকানায় পোস্টকার্ড পাঠাও। তাহলে ঘরে বসেই পেয়ে যাবে।

স্বপ্নদীপ ॥ ৭৪ শীতলা লেন, কলকাতা-৫

হার্শেলের 'ধূমকেতু' ঃ ইউরেনাস

বিমান বসু

আজ থেকে মাত্র দুশো বছর আগে আমাদের সৌরমণ্ডল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অনেক সীমিত ছিল। সেসময় মনে করা হত যে, পৃথিবীকে নিয়ে সৌরমণ্ডলে মাত্র ছ টি গ্রহ আছে যাদের মধ্যে সবচেয়ে দূরের গ্রহ হলো শনি। এরকম হওয়ার অবশ্য একটা বিশেষ কারণ ছিল। যেমন ধরো বুধ, শুক্র ও মঙ্গল আকারে ছোট হলেও পৃথিবীর খুব কাছে থাকার দরুন সেগুলিকে শুধু চোখেই দেখতে পাওয়া যায়। আবার অন্যদিকে বৃহস্পতি ও শনির দূরত্ব খুব বেশি, কিন্তু সেগুলি আয়তনে খুব বড়। সেজন্যে তাদেরও সহজেই শুধু চোখে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সৌরমণ্ডলের বাকি তিনটি গ্রহ ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর বেলায় তা নয়। বাইরের ঐ তিনটি গ্রহ আকারেও খুব একটা বড় নয়, অথচ পৃথিবী থেকে তাদের কক্ষ-পথের দূরত্ব অনেক বেশি। সেজন্যে দূরবীন আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত সেগুলির সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য অনেকে মনে করেন, আকাশ খুব পরিষ্কার থাকলে অমাবস্যার রাত্রে ইউরেনাসকেও শুধু চোখে দেখা সম্ভব। তবে তাকে এত ক্ষীণ দেখাবে যে তা না দেখতে পাওয়ারই মতো। আর সেজন্যেই হয়তো প্রাচীনকালের জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা কেউই ইউরেনাসকে নিয়ে মাথা ঘামান নি।

সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকের তিনটি গ্রহের প্রথমটির সন্ধান পাওয়া যায় 1781 সালে। অবশ্য সেসময় কেউ ভাবতেই পারত না যে, শনিগ্রহের চেয়ে দূরেও কোনও গ্রহ থাকতে পারে। আর সেজন্যেই যখন বিখ্যাত জ্যোতি বিজ্ঞানী উইলিয়ম হার্শেল তাঁর দূরবীনে ইউরেনাসকে প্রথম দেখতে পেলেন তখন তিনি তাকে 'ধূমকেতু' বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

ঘটনাটা ঘটেছিল 1781 সালের 13 মার্চ তারিখে। সেদিন রাত্রে ইংলণ্ডের বাথ শহরে হার্শেল তাঁর নিজের তৈরী প্রতিফলক দূরবীনে মিথুন রাশির তারাগুলির অধ্যয়ন করতে গিয়ে তাদের মধ্যে নতুন এক জ্যোতিষ্ককে দেখতে পেলেন, যেটাকে দেখতে অনেকটা গ্রহের মতো। কিন্তু বইপত্র ঘেঁটে হার্শেল দেখলেন যে, মিথুন রাশিতে সেসময় কোনও গ্রহের থাকার কথা নয়। অন্ততঃ সে সময় যে কটি গ্রহের বিষয় মানুষ জানত সেগুলির কোনওটির তো নয়ই। প্রথমে হার্শেল মনে করলেন, তিনি হয়তো কোনও নতুন ধূমকেতুর সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই ধারণা কিছুদিনের মধ্যেই ভুল প্রমাণিত হলো। অঙ্ক কষে জ্যোতিষ্কটির কক্ষপথ নির্ণয়ের পর দেখা গেল যে, সেটা আসলে একটা গ্রহ, সৌরমণ্ডলের অন্য গ্রহগুলির মতোই সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। তবে সূর্য থেকে গ্রহটির দূরত্ব পাওয়া গেল অন্যান্য গ্রহের তুলনায় অনেক বেশি, গড়ে প্রায় 287 কোটি 50 লক্ষ কিলোমিটার। মানে সূর্য থেকে শনির যা দূরত্ব তার দ্বিগুণের চেয়েও বেশি।

হার্শেল প্রথমে সদ্যআবিষ্কৃত ঐ গ্রহটির নাম ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের নামানুসারে রাখেন 'জর্জের তারা'। অন্যান্যরা আবার গ্রহটিকে 'হার্শেল' বলেই অভিহিত করেন। অবশেষে 1850 সাল নাগাদ গ্রহটির নাম রাখা হয় ইউরেনাস।

সূর্য থেকে দূরত্ব দেখে তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ যে, সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরতে ইউরেনাসের অনেক বেশি সময় লাগা উচিত। হ্যাঁ, ঠিক তাই। চার দিকে একবার ঘুরে আসতে গ্রহটির সময় লাগে 84 বছর। আয়তনে বৃহস্পতি ও শনির চেয়ে অনেক ছোট হলেও পৃথিবীর তুলনায় ইউরেনাস অনেক বড়। ইউরেনাসের গড় ব্যাস হলো 51, 800 কিলোমিটার, মানে পৃথিবীর ব্যাসের চারগুণ। আয়তনে ইউরেনাস পৃথিবীর চেয়ে প্রায় 70 গুণ বড়, কিন্তু ঘনত্ব কম হওয়ার দরুন এর ভর পৃথিবীর চেয়ে মাত্র $14\frac{1}{2}$ গুণ। এর কারণ কি তা তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে। হ্যাঁ, ইউরেনাসও হলো বৃহস্পতি ও শনির মতো হাল্কা গ্যাসীয় পদার্থের তৈরী। অবশ্য এখানে একটা তফাৎ আছে। তা হলো এই যে, সূর্য থেকে বহু দূরে থাকার দরুন ইউরেনাস এত ঠাণ্ডা যে এর প্রায় সমস্ত গ্যাসই জমাট অবস্থায় আছে। বর্ণালী বিশ্লেষণ করে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয়, ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডলের বেশির ভাগটাই হলো মিথেন গ্যাসের তৈরী। আর সেজন্যেই গ্রহটিকে দূরবীনে

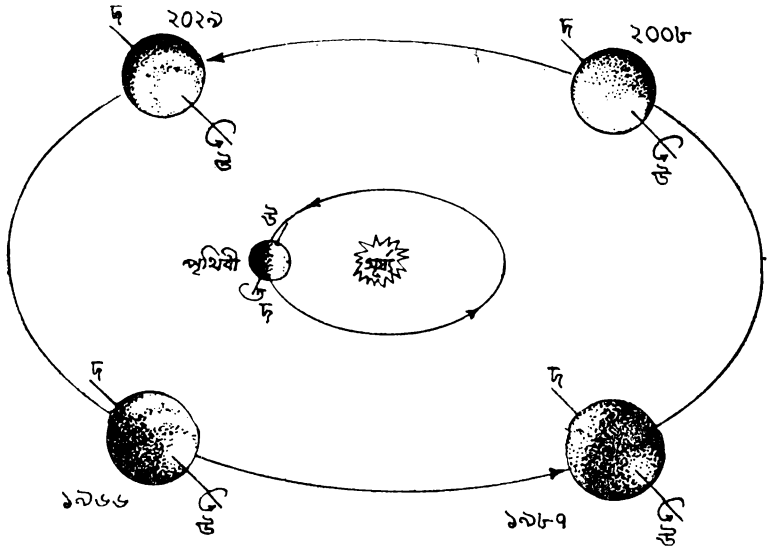

কক্ষপথে ইউরেনাস। দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি 42 বছর অন্তর পৃথিবী থেকে গ্রহটির মেরু অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায়।

হাল্কা সবুজ রঙের দেখায়। ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের তাপমাত্রা পাওয়া গেছে শূন্যেরও 210 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে।

পৃথিবী থেকে অত দূরে থাকার দরুন শক্তিশালী দূরবীনেও ইউরেনাসের ওপর বেশি একটা কিছু চোখে পড়ে না। কেবল কিছু হাল্কা ছোপ দাগ দেখতে পাওয়া যায়। ঐ সব দাগের অধ্যয়ন করে গ্রহটির আহ্নিক গতির একটা আভাস বিজ্ঞানীরা অনেক দিন আগেই পেয়েছিলেন, কিন্তু তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আগে মনে করা হত যে, গ্রহটি নিজের অক্ষে 10 ঘণ্টা 49 মিনিটে এক পাক খায়। কিন্তু পরে জানতে পারা গেছে যে, সেই ঘূর্ণনের হার সম্ভবত 16 ঘণ্টায় এক বার।

আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো ইউরেনাসের অক্ষের নতি। তোমরা দেখেছ যে, বেশির ভাগ গ্রহের অক্ষ তার কক্ষতলের ওপর সিধে খাড়া অবস্থায় নেই, কিছুটা হেলে আছে। যেমন ধরো, পৃথিবীর অক্ষ হেলে আছে $23\frac{1}{2}$ ডিগ্রী, মঙ্গলের 24 ডিগ্রী, বৃহস্পতির 3 ডিগ্রী আর শনির $26\frac{1}{2}$ ডিগ্রী। কিন্তু ইউরেনাসের বেলায় এই নতির হার অনেক বেশি। গ্রহটির অক্ষ তার কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় 98 ডিগ্রী হেলে আছে। দেখে মনে হয়, গ্রহটি যেন শুয়ে শুয়ে পাক খেতে খেতে কক্ষপথে এগিয়ে চলেছে। আর একটা মজার কথা হলো এই যে, সমকোণ থেকেও প্রায় 8 ডিগ্রী বেশি হেলে থাকার ফলে ইউরেনাসকে পূব থেকে পশ্চিমে পাক খাচ্ছে বলে মনে হয়।

আজ পর্যন্ত ইউরেনাসের পাঁচটি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে দূরের এবং বড় দুটি আবিষ্কার করেন হার্শেল নিজে 1787 সালে। এ দুটির নাম টাইটানিয়া (ব্যাস 1০00 কিলোমিটার) এবং ওবেরন (ব্যাস 1560 কিলোমিটার)। মূলগ্রহ থেকে এদের দূরত্ব যথাক্রমে 4,38,300 কিলোমিটার এবং 5,86,200 কিলোমিটার।

এরপর 1851 সালে আরও দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন ইংলণ্ডের উইলিয়ম লাসেল। উপগ্রহ দুটির নাম রাখা হয় এরিয়েল এবং আমব্রিয়েল। ব্যাস 1000 থেকে 1500 কিলোমিটারের মধ্যে। মূল গ্রহ থেকে এরিয়েলের দূরত্ব পাওয়া যায় 1,91,700 কিলোমিটার, আমব্রিয়েলের 2,67,100 কিলোমিটার।

ইউরেনাসের সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ 'মিরাণ্ডা'র সন্ধান

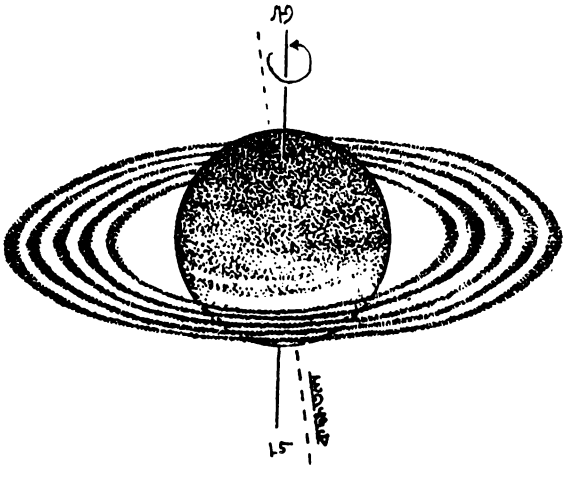

ইউরেনাসের বলয়

পাওয়া যায় 1948 সালে। মাত্র 300 কিলোমিটার ব্যাসের উপগ্রহটি আবিষ্কার করেন আমেরিকার জি পি কুইপার। ইউরেনাস থেকে মিরাণ্ডার দূরত্ব হলো মাত্র 1,30,400 কিলোমিটার।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। ইউরেনাসের পাঁচটি উপগ্রহই রয়েছে বিষুব বরাবর আর তাদের কক্ষপথ হলো বৃত্তকার। মূল গ্রহের মতো উপগ্রহগুলির গতিও পূব থেকে পশ্চিমে।

বলয় আছে তা হলে সহজেই এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কারণ তারাটির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রথমে পাঁচটি বলয়ের ছায়া দেখা যাবে, মানে পাঁচবার তারাটি প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। আবার কিছুক্ষণ পরে, মূল গ্রহটি তারার সামনে থেকে সরে যাওয়ার পর, আবার পাঁচটি বলয়ের ছায়া দেখা যাবে, মানে আরও পাঁচ বার তারার আলো কমে যাবে। সুতরাং এভাবে তারার আলোর কম বেশি দেখেই গ্রহটির বলয়ের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব।

ইউরেনাসের উপগ্রহ ও অন্যান্য তথ্য

উপগ্রহ	ব্যাস	গ্রহ থেকে দূরত্ব	আবিষ্কারের তারিখ
মিরাণ্ডা	300 কিলোমিটার	1,30,400 কিলোমিটার	1948
এরিয়েল	1500 কিলোমিটার	1,91,700 কিলোমিটার	1851
আমব্রিয়েল	1000 কিলোমিটার	2,67,100 কিলোমিটার	1851
টাইটানিয়া	1800 কিলোমিটার	4,38,300 কিলোমিটার	1787
ওবেরন	1560 কিলোমিটার	5,86,200 কিলোমিটার	1787

ইউরেনাসের আবিষ্কারের ঠিক 196 বছর পর 1977 সালের 10 মার্চ তারিখে আর একটি মহত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। সেদিন রাত্রে সর্বপ্রথম ইউরেনাসের বলয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যাপারটা ঘটে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে। ভারতের কাভালুর ও নৈনিতাল মানমন্দির সহ বিশ্বের কয়েকটি মানমন্দিরে সেদিন ইউরেনাসকে পর্যবেক্ষণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণ তুলারাশির একটি তারার সামনে দিয়ে গ্রহটির ঐ দিন যাওয়ার কথা ছিল। ইউরেনাসের পেছনে চলে যাওয়ার ঠিক আগে ও পরে তারাটির আলোয় যে তারতম্য হয় তা বিশ্লেষণ করে ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল ঐ পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ঘটনাটির পর তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অবাক! তাঁরা দেখলেন যে, আলোর তারতম্যের যে নক্সা পাওয়া গেছে তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে ধরে নিতে হবে যে গ্রহটিকে ঘিরে শনির মতো একাধিক বলয় আছে।

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। যদি ইউরেনাসের বলয় না থাকত, তবে তারার আলো প্রথমে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেত, আবার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎই দেখা যেত। ঠিক যেমনটি হয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের বেলায়। কিন্তু এখানে তা হলো না। দেখা গেল, তারার আলো কমপক্ষে দশ বার অদৃশ্য হয়েছে। এখন যদি আমরা ধরে নিই যে, ইউরেনাসের চারপাশে পাঁচটি

তথ্য বিশ্লেষণ করে জানতে পারা গেছে যে, ইউরেনাসকে বেষ্টন করে কমপক্ষে পাঁচটি বলয় আছে, কারও মতে আবার ঐ সংখ্যা নয়ও হতে পারে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভেতরের বলয়টির ব্যাস হলো আনুমানিক 88000 কিলোমিটার আর সবচেয়ে বাইরেরটির ব্যাস প্রায় 1,02,000 কিলোমিটার। চওড়ায় বলয়গুলি সম্ভবতঃ 10 থেকে 100 কিলোমিটারের বেশি নয়।

ইউরেনাসের বিষয় আমরা আজ পর্যন্ত যা কিছু জানতে পেরেছি তার সবটাই হলো কেবলমাত্র দূরবীনে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে। কিন্তু গ্রহটির দূরত্ব এত বেশি যে কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন ধরো গ্রহটির ভেতরের গঠন, আহ্নিক গতি, উপগ্রহগুলির ব্যাস, তাদের দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক তথ্য আজও পাওয়া সম্ভব হয় নি। এছাড়া গ্রহটির বলয়ের গঠনের বিষয়েও অনেক কিছু জানবার আছে।

আগামী 1986 সালের গোড়ার দিকে ভয়েজার-2 গ্রহযানটির ইউরেনাসের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কথা আছে। সেসময় গ্রহটি সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হতে পারে, সেসব তথ্য ও ছবি থেকেই 'হার্শেলের ধূমকেতু'র আসল রূপটা আমাদের সামনে আসবে।

---

7 ইউ এফ কলেজ রোড, নয়াদিল্লী-1

দেশলাই আবিষ্কারের কাহিনী

প্রণব ছোড়

দৈনন্দিন জীবনে আগুনের প্রয়োজন আমাদের অনেক-খানি। সুখের ব্যাপার, আগুন জ্বালাতে হলে আজকাল আমাদের একদম কষ্ট করতে হয় না। রান্নাঘরে গিয়ে দেশলাইয়ের বাক্স থেকে একটা কাঠি বের করে তার খয়েরী রঙের মাথাটা বাক্সের গায়ে বিশেষ একটা অংশে ঘষে দিলেই ঝপ্ করে জ্বলে ওঠে ঐ কাঠিটা। সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল আগুন।

অথচ এককালে এই আগুনের জন্যে পৃথিবীর আদিম মানুষদের কি পরিশ্রমই না করতে হত! গাছের শুকনো ডালে গর্ত করে তার ভেতর আর একটা শুকনো কাঠি ঢুকিয়ে দুই হাতের তালু দিয়ে প্রচণ্ড বেগে সেটা ঘুরিয়ে আগুন জ্বালাত তারা। গাছের শুকনো ডালের ঘর্ষণে দাবানলের সৃষ্টি দেখেই হয়তো এই বুদ্ধি এসেছিল তাদের মাথায়।

কিন্তু এতে অসুবিধা ছিল অনেক। প্রথম কথা হঠাৎ আগুনের প্রয়োজন হয়ে পড়লে তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালানো সম্ভবপর ছিল না। তা ছাড়া শ্রমসাধ্য ব্যাপার তো ছিলই। তাই মানুষ চিন্তা করতে লাগলো কি করে আরো সহজতর উপায়ে আগুন জ্বালানো যায়। অবশেষে লৌহ যুগে এসে এর কিছুটা সমাধান হলো। চকমকি পাথরের সঙ্গে ইস্পাতের ঘর্ষণে আগুন জ্বালাতে শিখলো মানুষ। দেখতে দেখতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে পড়লো এবং একটানা এটা চললো ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত। কিন্তু মানুষ এতেও খুশী রইলো না। সে আরো উন্নত উপায়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করেই যেতে লাগলো ক্রমাগতভাবে।

ইতিমধ্যে 1670 খ্রীষ্টাব্দে ব্রাণ্ড নামক জনৈক বিজ্ঞানী প্রাণীর অস্থি থেকে শ্বেত ফসফরাস নামে এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। এই শ্বেত ফসফরাস বাতাসের সংস্পর্শে থেকে 30° সেণ্টিগ্রেড তাপাঙ্কে পৌঁছলেই প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। শ্বেত ফসফরাসের এই ধর্মকে এবার তাই সরাসরি কাজে লাগাতে চেষ্টা করতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু এতে নতুন এক সমস্যা দেখা গেল। শ্বেত ফসফরাস জ্বলে ওঠামাত্রই যে ধোঁয়া সৃষ্টি হতে লাগলো তা হলো ফসফরাস পেণ্টোক্সাইডের ধোঁয়া। মানুষের পক্ষে এ অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস।

এক মজার উপায়ে তখন শ্বেত ফসফরাসকে লাগানো হলো। কাচের টিউবে শ্বেত ফসফরাস ভরে মানুষ দূর থেকে তা ছুঁড়ে মারত চর্বি বা গন্ধক মাখানো কাঠের গায়ে। মুহূর্তের ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত আগুন ঐ কাঠটাতে। সেই সঙ্গে দূরে থাকার জন্যে ফসফরাস পেণ্টোক্সাইডের ধোঁয়া থেকেও নিষ্কৃতি পেত মানুষ।

এর কিছুদিন পরে চ্যানসেল নামক এক বিজ্ঞানী 'ডিপিং ম্যাচ' নামক এক জাতীয় দেশলাই আবিষ্কার করলেন। একটি সরু কাঠির মাথায় তিনি পটাশিয়াম ক্লোরেট এবং চিনি মাখালেন। তারপর কাঠির অপর প্রান্ত ধরে আলতোভাবে মশলা মাখানো কাঠির মাথাটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে ডোবালেন। মুহূর্তে জ্বলে উঠলো আগুন কাঠিটার গায়ে।

এরপর 1827 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 'ঘর্ষণ দেশলাই' আবিষ্কার করলেন জন ওয়াকার নামে জনৈক ইংরেজ বিজ্ঞানী। তাঁর তৈরী এই দেশলাইয়ের নাম রাখা হলো 'লুসিফের ম্যাচ।' কাঠির মাথায় পটাশিয়াম ক্লোরেট ও অ্যাণ্টিমনি সালফাইড আঠা দিয়ে লাগিয়ে, সিরিষ কাগজে খুব জোরে তা ঘষলেই জ্বলে উঠত কাঠিটা। কিন্তু মুস্কিল হলো, এই পদ্ধতিতে একশোটার মধ্যে মাত্র তিরিশ চল্লিশটা কাঠি জ্বলত, বাকিগুলোর হয় কাঠি থেকে মশলা খসে পড়ে যেত, নয়তো জোরে ঘর্ষণে'র জন্যে কাঠিটাই হঠাৎ ভেঙে যেত। ফলে এই দেশলাই খুব জনপ্রিয় হলো না।

এর অনতিকাল পরেই 1845 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী স্রোটার শ্বেত ফসফরাস থেকে লোহিত ফসফরাস তৈরী করতে সমর্থ হলেন। তিনি একটি লৌহ-প্রকোষ্ঠে সামান্য আয়োডিন সহ নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন বা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ভেতর শ্বেত ফসফরাস নিয়ে 250° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তাকে উত্তপ্ত করে লোহিত-ফসফরাস প্রস্তুত করলেন। সৌভাগ্যের ব্যাপার, শ্বেত ফসফরাসের মতো এই লোহিত ফসফরাস বিষাক্ত হলো না এবং বাতাসের সংস্পর্শে এসে সামান্য তাপাঙ্কে চট্ করে জ্বলেও উঠলো না।

বিজ্ঞানীরা এবার তাই নব উদ্যমে আবার লেগে পড়লেন লোহিত ফসফরাস দিয়ে দেশলাই আবিষ্কার করার জন্যে। অবশেষে মাত্র দশ বছরের মধ্যে 1855

খ্রীষ্টাব্দে ল্যাণ্ডষ্টর্ম এবং কপিং নামে সুইডেনের দুজন বিজ্ঞানী এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করলেন। তাঁরাই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলেন 'সেফটি ম্যাচ' বা নিরাপদ দেশলাই।

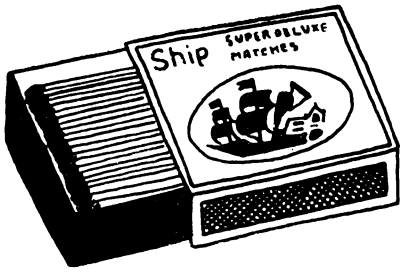

সেফটি ম্যাচ

এই দেশলাইতে সরু কাঠির মাথায় অ্যাণ্টিমনি সালফাইড, পটাশিয়াম ক্লোরেট, পটাশিয়াম ডাই-ক্রোমেট এবং রেডলেড একত্রে মিশ্রিত করে আঠা দিয়ে আটকানো থাকে। তারপর যে বাক্সের ভেতর এই কাঠিগুলি থাকবে সেই বাক্সের দু-ধারে লোহিত ফসফরাস, অ্যাণ্টিমনি সালফাইড ও কাচের গুঁড়ো আঠা দিয়ে লাগানো হয়। এবার ঐ কাঠির মশলাযুক্ত মাথাটা বাক্সের অমসৃণ দুধারের যে কোনো একটিতে সামান্য একটু ঘষলেই যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাতে পটাশিয়াম ক্লোরেটের নিকটবর্তী হয়ে লোহিত ফসফরাস জারিত হয়। এই বিক্রিয়ায় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং অ্যাণ্টিমনি সালফাইডের সালফার জ্বলে উঠে কাঠির মাথাটায় আগুনে ধরিয়ে দেয়। এই আগুন যাতে নিভে না যায় সেজন্যে কাঠির গায়ে মোমের আস্তরণ দেওয়া থাকে।

এই দেশলাইকে নিরাপদ বলার কারণ, এর প্রধান উপাদান দুটি যথা লোহিত ফসফরাস এবং পটাশিয়াম ক্লোরেট পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকে। ফলে হঠাৎ কোনো আগুন জ্বলে ওঠার ভয় থাকে না।

সমস্ত পৃথিবীতে তাই আজ এই 'সেফটি ম্যাচ' ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও অগ্নিদুর্ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি মানুষ আজও পায় নি। মাত্র একটি দেশলাইকাঠি থেকে মাঝে মাঝে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড লেগে যায়। তার কারণ এখনও সকল মানুষ বুঝতে পারে না একটি দেশলাইকাঠির শক্তি কি অপরিসীম হতে পারে। যেদিন সব মানুষ তা বুঝতে পারবে বিজ্ঞানের সেদিনই জয় হবে। সেই সঙ্গে সার্থক হবেন সেই সব বিজ্ঞানীরাও যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সৃষ্টি হয়েছে সর্বাধুনিক দেশলাই।

1-A ছাতুবাবু লেন, কলিকাতা-14

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঁচটি সচিত্র বই

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ১০,

স্যাম লয়েড ও লুইস ক্যারোলের

অঙ্ক ও ধাঁধার খেলা ১০,

সম্পাদনা করেছেন : সিদ্ধার্থ ঘোষ

অরূপরতন ভট্টাচার্য

রোবোট এল কেমন করে ৮,

সমরজিৎ কর

সমুদ্রের সম্পদ ১০,

অমরনাথ রায়

সায়েন্স ক্যুইজ ৮,

বইমেলায় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্টলে পাওয়া যাবে।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

নীলকণ্ঠ পাখিদের কথা

অজয় হোম

নীলকণ্ঠ বর্গের অন্যতম বংশ শার্ঙ্গের (মেরপদি) অন্তর্গত পাখিদের চঞ্চু লম্বা, সরু, গোড়া থেকে বাঁকা এবং উপর নিচ দুয়েরই অগ্রভাগ সূচঁলো। পা এবং আঙুল দুর্বল। বাইরের এবং মাঝের আঙুলের গোড়া ঝিল্লি দিয়ে জোড়া ; মাঝের ও ভিতরের আঙুলের গোড়ার অংশ যুক্ত। ভারতে শার্ঙ্গ বংশে 2টি গণ—শার্ঙ্গ (মেরপস্) ও নীলশ্মশ্রু (নাইকটাই অরনিস)।

বাঁশপাতি

শরতের শেষ, হেমন্তের গোড়া। পাখি লক্ষ্য করতে বার হয়েছি গোবরডাঙ্গা থেকে চাঁদপাড়ার দিকে। রেল লাইন ধরেই চলেছি। গাছগাছালির উপর রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। চারিদিকে সবুজের সুষমা।

বাঁশপাতি

টেলিগ্রাফের তারের উপর লক্ষ্য করলাম একটা পাখি। কচি ঘাসের রঙ তার গায়ে। রোগা ছিপছিপে। কালো চঞ্চু থেকে কালো কাজল টান চোখের উপর দিয়ে গেছে। উড়লো শূন্যে ডানা মেলে। আহা! ডানার তলায় কি রঙ! যেন সোনা ঝরে পড়ছে। লেজের মধ্যিখান দিয়ে দুটো পালক লম্বা হয়ে বেরিয়ে আছে। উড়ন্ত অবস্থায় ঢেউ খেলে ধরলো একটা পতঙ্গ। ফড়িং বলেই মনে হলো। গা ভাসিয়ে উড়ে এসে বসলো নিজের জায়গায়। অর্থাৎ ওই টেলিগ্রাফের তারের উপর। ধরা ফড়িংটাকে তারের উপর মারলো ঝাঁকানি বার দুই, তারপরেই মুখের ভিতর দিল পুরে।

পাখিটা শার্ঙ্গ বংশের (মেরপদি) অন্তর্গত এই নামের এক গণের (মেরপস্)। নাম—বাঁশপাতি, নরুনচেরা (মেরপস্ ওরিয়েণ্টালিস)। হিন্দী – পত্রিঙ্গা। ইংরেজি —গ্রীন বী-ঈটার। ভারতে 6টি প্রজাতি ও 2টি গণ।

বাঁশপাতি লম্বায় 8 ইঞ্চি, তার মধ্যে লেজের মাঝখান দিয়ে যে পালকের জোড়া বেরিয়ে থাকে সেটাই প্রায় 2 ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। সমস্ত পালকই বাঁশ-পাতার মতো উজ্জ্বল সবুজ। চোখের সামনে ও পিছনে কালো এক টান। চিবুক ও গলায় নীলের ছোপ, গলার নিচেই কণ্ঠহারের মতন একটা কালো টান। মাথার চাঁদি থেকে পিঠের উপরের অংশে লালচে-সোনালি আভা। ডানার তলা সোনালি-তামাটে। ওড়ার পালক লালচে, সেটা সবুজে ধোওয়া এবং আগায় কালচে ছোপ। কনীনিকা রক্ত-লাল। লম্বা সরু ঈষৎ বাঁকানো, চঞ্চু কালো। পা গাঢ় সীসে। হলদেটে-পাটকিলে পায়ের আঙুল দুর্বল এবং সামনের তিনটি আঙুলের গোড়া পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

বাসস্থান—পশ্চিমবঙ্গে যে প্রজাতিকে সাধারণত দেখি তার 4টি উপজাতি। প্রথম উপজাতি (মে ও ওরিয়েণ্টালিস) —উত্তর রাজস্থান ছাড়া ভারতের সর্বত্র, পূর্ব আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং নেপাল, বাংলাদেশে 5 হাজার ফুটের ভিতর। দ্বিতীয় 'সিন্ধু বাঁশপাতি' (মে ও বেলুডশ্চিক্যস) —দক্ষিণপূর্ব ইরান, পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং খুব সম্ভবত উত্তর ও পশ্চিম রাজস্থানে। তৃতীয় 'বর্মী বাঁশপাতি' (মে ও বিরমানাস)—পূর্ব আসামের কাছাড়ের পূর্বাংশে এবং ব্রহ্মদেশের নিম্নভূমিতে। চতুর্থ 'সিংহলী বাঁশপাতি' (মে ও সিলোনেনসিস)—শ্রীলঙ্কায় 1 হাজার ফুটের ভিতর শুষ্কভূমিতে।

খাদ্য—মৌমাছি, বোলতা, মথ, প্রজাপতি, ফড়িং ও উড়ন্ত কীটপতঙ্গ।

স্বভাব—বাঁশপাতি পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের একটি সাধারণ পাখি। লক্ষ্য পথে পড়বেই ট্রেনে যেতে যেতে টেলিগ্রাফের বা রেলের বেড়ার তারে বসে লেজ দোলাচ্ছে, না হয় সোনালি-তামাটে ডানার তলা দেখিয়ে ঘুরে এসে বসছে যেখান থেকে উড়েছিল সেখানে। কিংবা কোনও গাছের ডালে বা ঝোপের মাথায় বসছে বা উড়ছে, কখনওবা পাঁচিলের উপরে, এমনকি গরুমহিষের পিঠেও।

বাঁশপাতি ঘন জঙ্গল বা জলা জায়গা পছন্দ করে না। বর্ষাকালে এদের দেখতে পাওয়া বেশ মুশকিল। যেখানে কম বর্ষণ সেখানেই সরে যায়। সেকারণে খোলামেলা স্থানে, খেতের আশেপাশে বা খরা জায়গায় এদের দেখা যায় খুব বেশি। সাধারণত একটি বা দুটিকে দেখা গেলেও 15-20 বা আরও বড়ো দলে সময় সময় দেখা যায়। ওড়াটা বড়ো সুন্দর। গোটা কয়েক ডানার ঝাপট, তারপরই ডানা ছড়িয়ে ভাসা, মৌমাছি বা অন্যান্য পতঙ্গ দেখলেই নিমেষের মধ্যে উপর দিকে ঝাঁকি মেরে সাবলীল ভঙ্গিতে উঠে সেটিকে শূন্যে ধরে ঘুরে ফিরে আসে যেখান থেকে উঠেছিল সেখানে। চঞ্চুতে ধরা শিকারটিকে তারে বা ডালে ঠুকে মেরে সেটিকে খায়। ডাক দেয় মিষ্টি করে চাবি নাড়ার মতন—'ত্রি-ত্রি-ত্রি·· তিরপ্-তিরপ্-তিরপ্ টিট-টিট-টিট···' উড়তে উড়তে ডাকে বেশি। বসেও ডাক দেয়।

বাঁশপাতি বা নরুনচেরা রাত কাটায় দলবদ্ধ হয়ে ঘন পাতার গাছে। এই দল সময় সময় 200 থেকে 300-র পর্যন্তও হয়। দেখা যায়, নিম, জামরুল, বাঁশবন প্রভৃতিতে সন্ধ্যে হলেই এসে জড়ো হচ্ছে। রাতের বিশ্রামের আগে পর্যন্ত চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি খুবই হয়। থেকে থেকে চেঁচামেচি করতে করতে সবাই উড়ে আবার ঘুরে এসে বসে। এইভাবে চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। খুব ভোরে ওঠার রেওয়াজ এদের নেই, বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমায়। ঘুমনোটা বেশ মজার। সবাই গা ঘেঁষে একদিকে মুখ করে পাশাপাশি। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে ডানার মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুম দেয়। সে ঘুম ভাঙে রোদ ওঠার খানিক পরে।

ধূলাস্নানই ভালোবাসে। মাঝে মাঝে জলের উপর ছোঁ মারতে দেখা যায়, তা সেটা স্নান, না জলখাওয়া, না পোকা ধরা বোঝা যায় না। সম্ভবত পোকা খাওয়া। মৌমাছি খাবার যম বলে যাঁরা মৌমাছি পালন করেন তাঁদের এদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই দুরূহ হয়ে ওঠে।

প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে জুন। বাসা বানাতে মাটিতে সুড়ঙ্গ করে প্রায় 5 ফুট পর্যন্ত। সেই সুড়ঙ্গের শেষে ডিমপাড়ার ঘরটা হয় গোলাকার। নদীর উঁচু পাড় বা উঁচু মাটির ডিবিতে বাসা বানাবার স্থান প্রশস্ত বলে মনে করে। প্রবেশপথটা গোলাকার। খুব সুন্দর করে কাটা। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই সুড়ঙ্গ কাটে। ডিমঘরে কোনও আস্তরণ বা বিছানা বিছায় না। সুড়ঙ্গ পথে কিছু পতঙ্গাদির ভুক্তাবশেষ দেখা যায়। ডিম পাড়ে 4 থেকে 7টি চকচকে সাদা শক্ত খোলার, কোনও ছিট বা ছোপ তার উপর নেই। ডিমের মাপ—লম্বায় 0·75, চওড়ায় 0·7 ইঞ্চি।

অন্যান্য বাঁশপাতি

পশ্চিমবঙ্গে আরও যে কয়টি বাঁশপাতি দেখা যায় তারা হলো—

1. **লালমাথা বাঁশপাতি**—(মে লেশচেনঅলটি)। হিন্দী—লালশির পত্রিঙ্গা। ইংরেজি—চেস্টনাটহেডেড বী-ঈটার।

লম্বায় সাড়ে 8 ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। চোখের তলা দিয়ে কানের উপর পর্যন্ত একটা কালো লাইন। মাথা ঘাড় ও পিঠের নিম্নাংশ পর্যন্ত বাদামী লাল। লেজের উপর দিকের আচ্ছাদক পালক ফিকে নীল। ডানা ও লেজে সবুজের উপর কালো ছোপ। চৌকো লেজ, কিন্তু মাঝের পালক দুটি লম্বা নয়। গলা ফিকে হলুদ, বুকের সঙ্গে আলাদা করা আছে গাঢ় বাদামী পটি দিয়ে এবং ওই পটির তলায় শেষাংশে কালো টানা দাগ। বুক পেট এবং লেজের আচ্ছাদক ঘাস-সবুজ। কনীনিকা টুকটুকে লাল। চঞ্চু কালো। পা ভুষো কালো।

বাসস্থান—পশ্চিম ভারতে মহীশূরের বেলগাঁও অঞ্চল থেকে দক্ষিণে কেরালা, পুবে মাদ্রাজ, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরবঙ্গ, আসাম, নেপাল, বাংলাদেশ ;- আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, এবং শ্রীলঙ্কায় 5 হাজার ফুটের ভিতর।

স্বভাব—ঘন জঙ্গলের বাসিন্দা। 8 থেকে 30-এর দলে গাছের মাথায় নেড়া ডালে বসে থাকতে এবং সেখান থেকে উড়তে দেখা যায়। জঙ্গলের মধ্যে যেখান দিয়ে টেলিগ্রাফের তার গেছে সেখানে বসে। বাঁশপাতির মতো উড়ে আবার শিকার ধরে ফিরে আসে নিজের জায়গায় এবং খাদ্যও তাদের মতোই। জল ঘেঁষে উড়তে উড়তে বা জলের উপর কোনও গাছের ডাল থেকে লাল মাথা বাঁশপাতি জলের মধ্যে ঝপ্ করে পড়ে জল ছিটিয়ে স্বস্থানে উড়ে গিয়ে বসে গা পরিষ্কার করে। রাতে বাস করে দলবদ্ধ হয়ে কোনও গাছে বা নদীর ধারে নলখাগড়ার উপর। সন্ধ্যা হবার আগে থাকতেই সবাই এসে জড়ো হতে থাকে। লালমাথা খুব ভোরে ওঠে, বাঁশপাতির মতো দেরিতে নয়। সেসময় মিষ্টি ডাক দিতে থাকে। ডাক এবং আর সব স্বভাব বাঁশপাতির মতোই।

প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে জুন। নদীর ধারে বালির পাড়ে বা খাড়া শক্ত জমিতে একটু নিচুমুখো ঢালু গর্ত

খোঁড়ে গর্তের মুখটার ব্যাস 2 ইঞ্চির মতো, সুড়ঙ্গ 3 থেকে 8 ফুট এবং তার শেষে ডিমঘর লম্বায় প্রায় 6 ইঞ্চি, চওড়ায় 8 ইঞ্চি। কোনও আস্তরণ বিছায় না। ডিম পাড়ে 5-6টি চকচকে সাদা, কিছুটা গোলাকার। ডিমের মাপ—লম্বায় 0·87, চওড়ায় 0·75 ইঞ্চি।

2. **বড়ো বাঁশপাতি** (মে ফিলিপ্পিন্যাস)। হিন্দী—বড়া পত্রিঙ্গা। ইংরেজি—ব্লুটেইলড বী-ঈটার।

লম্বায় 12 ইঞ্চি, তার মধ্যে 2 ইঞ্চি লেজের মাঝের সূঁচালো পালক যা বার হয়ে আছে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। চঞ্চুর গোড়া থেকে চোখের উপর দিয়ে চওড়া কালো টান। এই কালো টানের উপরের অংশে খুব সরু করে এবং নিচে চওড়া করে নীল পাড়। উপরের পালক বাস্তিপ্রদেশ পর্যন্ত সবুজ তার উপর লালচে আভা, তারপর সবুজাভ-নীল। ডানার রঙ পিঠের চেয়ে গাঢ় লালচে-সবুজ, ডগা কালচে। লেজ সবুজাভ-নীল, তলা গাঢ় বাদামী, লেজের মাঝের লম্বা পালকের ডগায় কালো ছোপ। গলা লালচে-বাদামী, ক্রমে বুকে সবুজ, তারপর লেজের কাছ পর্যন্ত নীল। কনীনিকা টুকটুকে লাল। লম্বা বাঁকানো চঞ্চু কালো। পা ছাই-সীসে; বাইরের 3টি আঙুল পরস্পরের সঙ্গে তলার দিকে জোড়া।

বাসস্থান—পাকিস্তানে উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাব, ভারতে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, দক্ষিণ বোম্বাই, মহীশূরের কুর্গ, নেপাল, বাংলাদেশ। শীতকাল কাটায় শ্রীলঙ্কা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে।

স্বভাব—বড়ো বাঁশপাতি অল্প কয়েকের একদলে জঙ্গলের ধারে শিকার করে বেড়ায়। বসে উঁচু গাছের মগডাল বা বাঁশগাছের শেষ প্রান্তে। সেখান থেকে স্বভাব সুন্দর ভঙ্গিমায় উড়ে ভেসে পতঙ্গ ধরে ফিরে আসে স্বস্থানে। বড়ো ঝিল, জলা, এবং বাঁধের ধারেও দেখা যায়। টেলিগ্রাফের তার পেলে বসবেই। এটা শার্ঙ্গ বংশের ধারা। ডাকটাও বাঁশপাতির মতো, তবে জোর বেশি। ওড়ার ভঙ্গী অনেকটা হাওয়াশীলের. সেইসঙ্গে 'তিরিপ্…টি-টিউ ? …টি-টিউ ?' ডাকটাও ঘনঘন। পতঙ্গ সবই খায়, তবে পছন্দ করে মৌমাছি আর ফড়িং।

প্রজননকাল মার্চ থেকে জুন। কলোনি বাসা, অনেকগুলি কাছাকাছি। গাং-শালিকের সঙ্গে এদের দেখা যায় বাসা বানাবার সময়। বাসা বাঁধে নদীর উঁচু পাড়ে গর্তের ভিতর, না হয় ইঁটের পাঁজা যেখানে পোড়ায় তার পাশে মাটির বড়ো ঢিবির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে। সুড়ঙ্গটা হয় 4 থেকে 7 ফুটের ভিতর। সুড়ঙ্গটা সোজা কাটে না, একটু টেরাবেঁকা করে। ডিম পাড়ে শক্ত খোলার 4-5টি চকচকে সাদা। ডিমের মাপ—লম্বায় 0·88, চওড়ায় 0·77 ইঞ্চি।

3. **নীলদাড়ি বাঁশপাতি** বুকচেরা (নাইকটাইঅরনিস আবেরটনি)। কাছাড়ি—দাও হুকুরু। ইংরেজি—ব্লুবেয়ার্ডেড বী-ঈটার। নীলশ্মশ্রু গণের (নাইকটাইঅরনিস) প্রজাতি। ভারতে একটিমাত্র প্রজাতি।

লম্বায় 14 ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। লম্বা সরু ঈষৎ বাঁকা কালো চঞ্চু। উপরের পালক উজ্জ্বল ঘাস-সবুজ। চিবুক, গলার মাঝের পালক উজ্জ্বল মলিন নীল, এর মাঝে বড়ো বড়ো গাঢ় নীল পালক ঝুলে আছে দাড়ির মতো। বাকি তলার পালক গাঢ় পাটকিলে-হলুদ তার উপর সবুজের ছিট বুক ও তলপেটে। লেজ চৌকো, মাঝের পালক বার করা নয়। কনীনিকা উজ্জ্বল সোনালি-কমলা। চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, একদম ডগায় প্রায় স্বচ্ছ সাদাটে, তলার চঞ্চুর গোড়াটা ফিকে শিঙরঙা। পা ফিকে হলদেটে-সবুজ, নখর শিঙে-পাটকিলে।

বাসস্থান—পশ্চিমঘাটের দক্ষিণাংশ, পশ্চিম মহীশূর, পশ্চিম মাদ্রাজ, কেরালা, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ, আসাম, মণিপুর, নেপাল ও বাংলাদেশে 5 হাজার ফুটের ভিতর।

স্বভাব—বুকেচেরা বা নীলদাড়ি বাঁশপাতি পুরোপুরি জঙ্গলের পাখি। এদের দেখা যায় চিরসবুজ জঙ্গলে একা বা জোড়ায় সর্বোচ্চ গাছের মাথায়। একটু লাজুক প্রকৃতির। উড়ে পতঙ্গ বিশেষ ধরে না, ধরলেও নিজের জায়গায় সবসময় ফিরে আসে না, কীট খোঁজে পাতার ফাঁকে এবং ফুলের ভিতর। ফুলের মধুও খায়। জঙ্গলে শিমুল যখন ফোটে তখন এদের দেখা যায় চারপাঁচ জোড়ায় মধু খেতে এবং পোকা ধরতে। ওড়ার ধরনটা বড়ো বসন্তবউরির মতো। ডাকে কর্কশ গলায়—'কড়-র-র্…কড়-র-র্ কড়-ক্'। প্রথম ডাকটা দেবার সময় নীল দাড়ি ফুলিয়ে মাথা নিচু করে, তারপর এক-এক ডাকে আস্তে আস্তে মাথা তুলতে থাকে, শেষ ডাক দেয় মাথা-চঞ্চু একেবারে আকাশের দিকে তুলে।

প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট। জঙ্গলের ভিতর পার্বত্য স্রোতস্বতী, সংকীর্ণ গিরিখাত, ধ্বসা পাহাড়ের গায়ে বা পাহাড়ী রাস্তার ধারে যে খাড়াই তার গায়ে সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। সুড়ঙ্গের শেষে ডিমঘর। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই ডিমপাড়ার এক মাস আগে থাকতেই সুড়ঙ্গ খুঁড়তে আরম্ভ করে। ডিম ফোটানো ও সন্তান প্রতিপালনে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিম পাড়ে 4 থেকে 6টি গোলাকার ধবধবে সাদা, অল্প চকচকে, অনেকটা সাদাবুক মাছরাঙার সঙ্গে তুলনীয়। ডিমের মাপ—লম্বায় 1·18, চওড়ায় 1·10 ইঞ্চি।

8/2 বীরেশ গুহ স্ট্রীট, কলিকাতা-17

চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রথম

বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী।

পৃথিবীতে সব কিছু আবিষ্কারের একজন প্রথম আবিষ্কারক থাকেন। তাঁর আবিষ্কারের অনেক দিন পরে হয়তো সেই আবিষ্কারের অনেক উন্নতি হয়। কিন্তু প্রথম অজানা জিনিসকে লোকের চোখের সামনে আনার গৌরব সেই প্রথম আবিষ্কারকেরই।

তোমাদের কাছে চিকিৎসাশাস্ত্রের কয়েকটি প্রথম ঘটনার কথা বলব। ঠিক আবিষ্কার না বলে প্রথম ঘটনাই বলছি।

প্রথম অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি-1792 খৃষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ানরে অস্ত্র-চিকিৎসক ব্যারন ডমিনিক জাঁ নারী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত সৈন্যকে সরিয়ে আনবার জন্যে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির প্রবর্তন করেন। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর প্রধান সার্জন পিয়ার ফ্রান্সিস পারসির সহযোগিতায় স্ট্রেচার-বাহক দুজন নিয়ে এই দুই ঘোড়ার 'উড়ন্ত গাড়ি' প্রবর্তিত হয়। 1794 খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান যখন ইটালী আক্রমণ করেন তখন এই উড়ন্ত গাড়ি প্রথম ব্যবহার করা হয়।

প্রথম রক্তসঞ্চার—আজকাল রোগীর দেহে রক্ত দেওয়ার কথা সবাই জানি। কিন্তু এরও প্রথম দিন ছিল। 1667 খৃষ্টাব্দের 12 জুন জাঁ ব্যাপটিষ্টে ডেনিস এই কাজ করেন। তিনি ছিলেন মন্টপেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্র এবং গণিতের অধ্যাপক এবং রাজা চতুর্দশ লুই-র চিকিৎসক। তখনকার দিনে জ্বর বেশি হলে রক্ত মোক্ষণ করে চিকিৎসা করা হত। একটা পনের বছর বয়েসের ছেলেকে এইভাবে বিশবার রক্ত মোক্ষণ করানোতে সে রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। তখন অধ্যাপক ডেনিস একটা ভেড়ার বাচ্চার গলার ধমনী থেকে রক্ত নিয়ে ঐ ছেলেটির শিরায় দেন। অধ্যাপক ডেনিস লিখেছেন, ছেলেটির ফ্যাকাসে মুখ রক্ত দেবার পরেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং ছেলেটির প্রাণরক্ষা হলো। অবশ্যই বলতে হবে মানুষের শরীরে ভেড়ার রক্ত দেওয়া একটা খুব বিপজ্জনক পরীক্ষা। তবে এক্ষেত্রে সফল হয়েছিল।

প্রথম সিজারিয়ান অপারেশন।

রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আমলে এক আইন তৈরী হয়েছিল যে, কোনও গর্ভবতী মহিলা মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পেট কেটে শিশুটিকে বের করে ফেলতে হবে। কারণ শিশুটি তাতে বেঁচে যেতে পারে। এই আইন প্রাচীন ভারতেও ছিল। যাই হোক সিজারের সময় এই আইন হয় বলে এর নাম হয়েছিল সিজারিয়ান অপারেশন।

কিন্তু জীবন্ত মহিলার পেট কেটে জীবন্ত শিশু উদ্ধার এবং তারপরেও সেই মহিলার বেঁচে থাকা প্রথম এটা কিন্তু কোনও ডাক্তার করেন নি।

সুইজারল্যাণ্ডের সিগার-সফেন নামে এক গ্রামের একজন মানুষ বাস করত। তার পেশা ছিল ষাঁড়, পাঁঠা, ঘোড়াকে খাসী করা। নাম ছিল জ্যাকব নাইফার। ওর স্ত্রীর ছেলে হতে গিয়ে বিভ্রাট হলো। প্রসব আর হয় না। লোকটা তখন বেগতিক দেখে ওর নিজের যে সব যন্ত্রপাতি ছিল তাই দিয়ে পেট চিরে জীবিত সন্তান বের করে পেট সেলাই করে দিয়েছিল। এরপরে ঐ মহিলা 77 বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং আরও চারটি সন্তানের জননী হন।

ইতিহাসে যতদূর জানা যায়, এই প্রথম সফল সিজারিয়ান অপারেশন। 1500 খৃষ্টাব্দে এই অপারেশন হয়। ডাঃ ফ্রান্সিস রকেটের সিজারিয়ান অপারেশনের ইতিহাসে, যা 1581তে লেখা হয়, তাতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

প্রথম অজ্ঞান করে অস্ত্রোপচার—1842 খৃষ্টাব্দে 30 মার্চ ডাঃ ক্রফোর্ড লং জেমস, ডেরেবল নামে এক ছাত্রের গলার একটা টিউমার অপারেশন করেন ইথার দিয়ে অজ্ঞান করে।

এর আগে নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান এমন একজন বিজ্ঞানী জেফারসনে এসে ইথার সম্বন্ধে বর্ক্তৃতা করে গেছেন। জেফারসনের যুবকমহল সেই বক্তৃতা শুনে ডাঃ লং-এর কাছে এসে তাদের ইথার শোঁকাতে বলে। ডাঃ লংও ওদের একটু ইথার শুঁকিয়ে দিয়ে ওরা যখন নেশায় টলমল করত, তাই দেখে মজা পেতেন। কয়েকবার এইরকম করবার পর তাঁর মনে হলো কিছুটা বেশি শোঁকালে

এর ফলে পুরোপুরি অজ্ঞান করা সম্ভব। তখন তাঁর ঐ ছাত্রটিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঐ পরীক্ষা করাতে রাজী করালেন এবং সফলভাবে অপারেশন করলেন। ইথার শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে অপারেশন এই প্রথম। এই অপারেশনের পর ডাঃ লং মাত্র আড়াই ডলারের বিল দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর ইথার শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে আস্ত্রোপচার করার প্রচলন হয়।

প্রথম প্লাস্টিক সার্জারি

কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খুঁত বা ক্ষতিকে অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্যে মেরামত করে দেওয়াকে প্লাস্টিক সার্জারি বলা হয়। এমনই প্রথম প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছিল ব্রিটেনে ইয়র্ক হাসপাতালে 1814 খৃষ্টাব্দে 26 অকটোবর।

জোসেফ কনষ্টাটাইন কার্প নামে এক সৈনিকের নাক পারদবিষের ক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই নাককে মেরামত করা হয়েছিল। কপাল থেকে নাকের আকারের চামড়া কেটে নিয়ে তাই নাকের উপরে জোড়া লাগিয়ে এই নতুন নাক তৈরী হয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের নাক এবং কান তৈরী করে অস্ত্রচিকিৎসার কথা খৃষ্টেরও জন্মের আগে লেখা 'সুশ্রুত সংহিতায়' পাওয়া যায়।

সুশ্রুত নাকের পাশে গাল থেকে চামড়া নিয়ে নাকে বা কানে জোড়া লাগাতেন। কাজেই প্রথম প্লাস্টিক সার্জারির গৌরব প্রাচীন ভারতের অস্ত্র-চিকিৎসকদেরই প্রাপ্য।

রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর

বিজ্ঞানের বিস্ময়

সাহারা থেকে শীত, মেরু থেকে তাপ

সমীর মণ্ডল

শুনলে হ-য-ব-র-ল বলে মনে হবারই কথা। কিন্তু গত চল্লিশ হাজার বছরে সাহারার আবহাওয়া কখন কিরকম পরিবর্তন হয়েছে তাই নিয়ে গবেষণা করে রুশ বিজ্ঞানী ইরিনা বোরজেনকোভা এমনি চমকে দেবার মতো খবরই দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন উত্তর আফ্রিকা সমেত সাহারার আবহাওয়া যত গরম ও শুকনো হয়ে ওঠে, তত শীত পড়ে ইউরোপে। এরকম দৃষ্টান্ত তিনি ভুরি ভুরি খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের সাধারণ বায়ুপ্রবাহ সাহারায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ধারিত করে। বৃষ্টিপাতের হেরফেরের জন্যে সাহারার মরুপ্রান্তর নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে চিরকাল সীমাবদ্ধ থাকেনি। কখনো তার আয়তন বেড়েছে, কখনো কমে এসেছে, কখনো মরু-অঞ্চল ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরদিকে, কখনো দক্ষিণ দিকে, আবার কখনো কখনো মরুপ্রান্তরের বালিয়াড়ি নিশ্চিহ্ন করে সাহারায় সবুজ প্রাণ দেখা দিয়েছে। সাহারার জলীয় বাষ্পের পরিমাণের সঙ্গে পুরো গোলার্ধের আবহাওয়ার একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। গত পাঁচশো বছরে প্রতি একশো বছর অন্তর উত্তর আফ্রিকায় জলকষ্ট দেখা দিয়েছে এবং এই খরা প্রতিবার একটানা পাঁচ-ছয় বছর স্থায়ী হয়েছে। আর ঠিক একই সময়ে ইউরোপে শৈত্যপ্রবাহ চলেছে।

এতো গেল সাহারার কথা। মেরু অঞ্চলেও এক অদ্ভুত ঘটনার কথা জানতে পেরেছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। দুই মেরুর ঊর্ধ্বে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অপ্রত্যাশিত ও দ্রুত তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ধরা পড়েছে। রেডিও-তরঙ্গ মারফৎ অনুসন্ধান থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের 50 কিলোমিটার ঊর্ধ্বে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে উঠে যেতে পারে।

সাধারণতঃ ভূচৌম্বকীয় অঞ্চলের ওপর এই ধরনের তাপ "বিস্ফোরণ" ঘটে এবং তারপর আবহাওয়ার তোয়াক্কা না করে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

লেনিনগ্রাডের উত্তর ও দক্ষিণ-মেরু গবেষণা সংসদের বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সূর্যের কণিকা বিকিরণ এবং বায়ু-মণ্ডল ও মহাকাশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিক্রিয়াই এর জন্যে দায়ী। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই ধরনের "তাপ বিস্ফোরণ" ঘটবার পর চৌম্বকীয় ঝঞ্ঝা দেখা দেয়।

1983-র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

জীবনবিজ্ঞানের আলোচনা

তারকমোহন দাস

জীবনবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিষয়টি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী অবধি পড়ানো হয়ে থাকে। সুতরাং মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে শুধু নবম ও দশম শ্রেণীর সিলেবাস ধরে পড়লেই চলবে না, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পুরানো বইগুলিও একবার দেখে নিতে হবে। আমরা গত মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে লিখেছিলাম—বরাবরই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এমন কিছু প্রশ্ন আসছে যা ষষ্ঠ, সপ্তম অথবা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ানো হয়েছে। যেমন কোষের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে, কলা সম্পর্কে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহবৈশিষ্ট্য ও আচরণ সম্পর্কে। সুতরাং পরীক্ষায় যারা ভাল করতে চাও তারা ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞানের বইগুলিও একবার দেখে নিও। গত মাধ্যমিক পরীক্ষার জীবনবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র খুলে দেখ, সেখানে দেখবে পুরাপুরি 2 নং পর্বটিই সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর বই থেকে করা হয়েছে। যেমন 8 নং প্রশ্ন—একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষ অঙ্কন কর ও উহার বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত কর (অষ্টম শ্রেণী)। 7 নং প্রশ্ন—একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্র অঙ্কিত করিয়া প্রধান অংশগুলি চিহ্নিত কর (সপ্তম শ্রেণীর)। 6 নং প্রশ্ন—একটি কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক নালী অঙ্কন কর ও বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত কর (অষ্টম শ্রেণী)। সুতরাং যারা পুরনো বই না দেখে গেলে বা পুরনো পড়া মনে ছিল না তাদের একটি পর্বই বাদ দিতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, আরো আছে। যেমন একটি প্রাণীর নাম কর যাহার পুঞ্জাক্ষি আছে (1 নং প্রশ্ন) অথবা উদ্ভিদের সংবহন কলার নাম লিখ (9 নং প্রশ্ন)। এ দুটি প্রশ্নও সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বই থেকে নেওয়া।

সুতরাং এবারও আমাদের প্রথম অনুরোধ, পরীক্ষার আগে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞানের বইগুলি একবার দেখে নিও। বিশেষ করে পরিবেশের উপাদান, সজীব পদার্থের বৈশিষ্ট্য, কোষ ও কলার গঠন, ফুল, ফল ও প্রাণিদেহের গঠনবৈশিষ্ট্য এবং ব্যাপন, অভিস্রবণ শোষণ, পরিবহন, প্রস্বেদন প্রভৃতির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ইত্যাদি।

আমাদের দ্বিতীয় অনুরোধ হলো, বাংলায় লেখা প্রশ্নপত্রটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে লেখা প্রশ্নপত্রটিও একবার মিলিয়ে দেখো, তা হলে প্রশ্নগুলি সঠিকভাবে ধরতে পারবে, অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। গতবারই 1 নং প্রশ্নে ছিল 'মিয়োসিস' প্রক্রিয়ার দুইটি তাৎপর্য উল্লেখ কর। কিন্তু অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে মিয়োসিস নেই, সেখানে আছে মায়োসিস, অথবা মাইয়োসিস, এমন কি মেয়োসিসও দেখতে পাবে। এগুলি কিন্তু একই বৈজ্ঞানিক শব্দ Meiosis-এর বিভিন্ন বাংলা বানান। সুতরাং একমাত্র ইংরেজিতে লেখা প্রশ্নপত্রটি পড়লেই তোমাদের কাছে মিয়োসিসের অর্থ পরিষ্কার হবে।

তা ছাড়া পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বেশ কিছু বানান ভুল থাকে। এ পর্যন্ত আমরা এমন কোন জীবনবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র পাই নি যেখানে বিশ্রীরকম বানান ভুল নেই। এজন্যে পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুত থাকতে হবে, বানান ভুলের ফলে অনেক সময় হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। যেমন গত বছরই 13 নং প্রশ্নে ছিল 'সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ শঙ্করায়ণ।' কিন্তু এটি শঙ্কর বা মহাদেব সম্পর্কিত কিছু ব্যাপার নয়—এটি হচ্ছে সঙ্কর বা Hybrid সম্পর্কিত ব্যাপার। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি ইংরেজি প্রশ্নপত্রটি পড়ছ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সন্দেহ নিরসন হবে না। গত বছরের প্রশ্নপত্রেই বানান লেখা হয়েছে বর্জ্যর বদলে বর্জ, ধমনীর বদলে ধমণী, ফণিমনসার বদলে ফণিমনশ, অঙ্কনের বদলে অঙ্কণ ইত্যাদি। সুতরাং সামনের বছরে এই ধরনের প্রশ্নপত্র পাবে না এমন আশা না করাই ভাল, বরং এই ধরনের প্রশ্নপত্রের জন্যে মনে মনে প্রস্তুত থাকাই ভাল এবং তা পেলে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ইংরেজি প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে সঠিক উত্তরটি সংক্ষেপে লিখে ফেলবে। কিন্তু ইংরেজি প্রশ্নের সঙ্গে যদি বাংলা প্রশ্নের আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকে তা হলে কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। তবে আমাদের মনে হয়, প্রশ্ন দুটি পরস্পর স্বতন্ত্র হয়, কিন্তু তাতে যদি কোন ভুল না থাকে (এককভাবে), তা হলে যে পরীক্ষার্থী বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দিচ্ছে সে বাংলা ভাষায় লেখা প্রশ্নটির উত্তর করবে, যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দিচ্ছে সে ইংরাজিতে লেখা প্রশ্নটির উত্তর করবে। তবে কোন ভাষার প্রশ্নে যদি ভুল বা বিচ্যুতি থাকে তা হলে অন্য ভাষায় সঠিকভাবে লেখা ঐ প্রশ্নটির উত্তর করবে। গতবার যেমন 1, 6, 10, 12, 13 ও 14 নম্বর প্রশ্নগুলির বেলায় ঘটেছে।

আমাদের তৃতীয় অনুরোধ হলো, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

নবম ও দশম শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞানের যে গাইড লাইন দিয়েছে পরীক্ষার্থীরা তা যেন বার বার পড়ে দেখে। একথা বলবার কারণ গত তিন বছর ধরে জীবন বিজ্ঞানের অধিকাংশ প্রশ্ন এবং প্রশ্নের ধরন ঐ গাইড লাইনের ভেতর থেকেই আসছে। অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকের প্রথমেই ঐ গাইড লাইন দেওয়া আছে।

আমাদের চতুর্থ অনুরোধ হলো, প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হওয়া দরকার। এজন্যে একাধিক পাঠ্য-পুস্তক পড়ে মূল বিষয়টি প্রথমে ভালভাবে বোঝা দরকার। একটিমাত্র পাঠ্যপুস্তক পড়লে মূল বিষয়টি নানাদিক দিয়ে সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রকাশ করবার জন্যে স্বকীয় দক্ষতা তেমন অর্জন করা যায় না। কিন্তু প্রশ্নই যদি অস্পষ্ট হয় তা হলে কি করবে? গতবার যেমন প্রশ্ন ছিল জৈব অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে প্রমাণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ কর (5 নং প্রশ্ন)। এই প্রমাণগুলি বলতে কটা প্রমাণ তুমি উল্লেখ করবে? এটা প্রশ্নপত্রে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া উচিত ছিল। পাঠক্রমে দুইটি প্রমাণের কথা আছে, কিন্তু আসলে আরো অনেকগুলি প্রমাণ আছে, যে পরীক্ষার্থী বেশী পড়েছে সে কি সব প্রমাণগুলি উল্লেখ করবে? এই প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠবে। এই ধরনের সমস্যায় পাঠক্রমের গাইড-লাইন পুরোপুরি অনুসরণ করে যাওয়া উচিত, অনাবশ্যক বেশি সময় নষ্ট করে বেশি লিখে লাভ কি?

বিজ্ঞানের আর একটি ভাষা হলো 'ছবি'। আমাদের পঞ্চম অনুরোধ হলো, পরীক্ষার্থীরা যখন সুযোগ পাবে তখনই ছবি এঁকে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করবে। গতবার তিনটি প্রশ্নে ছবি আঁকা বাধ্যতামূলক ছিল (6, 7 ও 8 নম্বর প্রশ্নে)। কিন্তু যেখানে ছবি আঁকার নির্দেশ নেই সেখানেও ছবি আঁকা উচিত, ভাষার ত্রুটি ছবি সংশোধন করবে। ছবি সব সময় লেবেল করতে হয়। বিজ্ঞানে লেবেল ছাড়া ছবির কোন মূল্য নেই, একথাটা মনে রেখো।

আমাদের সর্বশেষ অনুরোধ হলো, হস্তাক্ষর যেন সব সময় স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয় এবং বানান যেন যথাসম্ভব নির্ভুল হয়। প্রশ্নপত্রে ভুল বানান ছাপা থাকলেও কখনও তার অনুকরণ করো না, কেননা প্রশ্নপত্রের ওপরেই লেখা আছে ভুল বানান লিখলে তোমাদের নম্বর কাটা যাবে।

35 বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলি-19

ভয়ংকর সেই খুনে ধোঁয়াশা

সুমিতা পাল

কোন কল্পবিজ্ঞানের ঘটনা নয় এটি। এই ঘটনা একান্তই বাস্তব এবং ঘটেছিল পৃথিবীর একটি অতি সুসভ্য শিল্পোন্নত দেশে বর্তমান শতাব্দীতেই। মনুষ্যসৃষ্ট আবহাওয়া দূষণের ফল যে কী মারাত্মক হতে পারে এবং মানুষের জীবনে সে যে কী ভয়ংকর অভিশাপ ডেকে আনতে পারে তারই একটি নির্মম নজির এই ঘটনা।

1952 সালের 5 ডিসেম্বর। লণ্ডনের অধিবাসীরা এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলো। লণ্ডনের আবহাওয়ায় কুয়াশা একটি অতি সাধারণ ঘটনা এবং সেখানকার অধিবাসীরা খুব ভালভাবেই এর সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু এ যে এক অদ্ভুত কুয়াশা! কুয়াশা না বলে ধোঁয়াশা বলাই বোধ হয় ঠিক—ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলে এর সৃষ্টি। 5 ডিসেম্বর থেকে শুরু করে চারদিন পর্যন্ত সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এই ধোঁয়াশার শিকার হয়েছিল। লণ্ডনের জনবহুল অঞ্চলে এই ধোঁয়াশা এমন এক দুর্ভেদ্য আবরণের সৃষ্টি করে যার ফলে এক গজ দূরের জিনিসও দেখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। গাড়ি চালানো তো দূরের কথা, লোকে নিজের হাতপাও ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিল না, এমনই ঘন ছিল সেই ধোঁয়াশার জাল। দেশের সমস্ত বিমানবন্দর বন্ধ করে দিতে হয় এবং সমস্ত যানবাহন অচল হয়ে পড়ে।

হাঁটতে গিয়ে ভুল করে অনেকে টেমস নদীতে পড়ে যায়। রাস্তাঘাট চোর-ডাকাতের আড্ডাখানায় পরিণত হয় এবং লণ্ডন শহরে অপরাধের মাত্রাও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো এই যে, বহু লোক প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টের শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। মুমূর্ষু রোগীদের বাঁচানোর জন্যে ডাক্তার এবং নার্সরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তবুও প্রচুর লোক মারা যায়। 1952 সালের এই খুনে ধোঁয়াশার বলি হয়েছিল প্রায় চার হাজার মানুষ এবং অসুস্থ হয়েছিল আরো হাজার হাজার নর-নারী। এটাই এখন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আবহাওয়া দূষণের নজির।

এখন প্রশ্ন হলো, এই ভয়াবহ ঘটনার কারণ কী? ডিসেম্বরের কন্‌কনে ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে অধিক পরিমাণে কয়লা জ্বালানো হয়েছিল। এর ফলে উদ্ভূত প্রচুর ধোঁয়া এবং ভূষাজাতীয় ক্ষুদ্র কণা বাতাসে মিশে গিয়ে বাতাসকে ভীষণভাবে দূষিত করেছিল। সেই সময় সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপরস্থ বায়ুমণ্ডলে এক অদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যাকে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'তাপীয় ব্যতিক্রম' (Thermal Inversion)। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের কিছুটা উপরিভাগে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বাতাসের এক আচ্ছাদনের সৃষ্টি হয়।

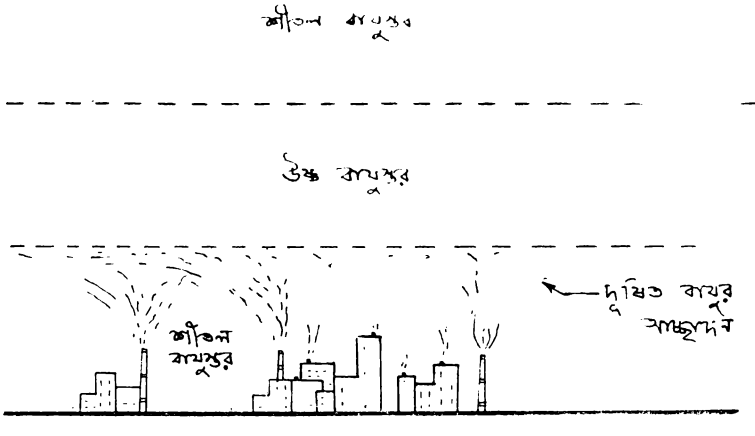

বেশির ভাগ লোকই ঘরের মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়, যেহেতু রাস্তায় বের হওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। রাস্তায় এই উষ্ণ বাতাসের অবস্থিতির ফলে নিচের বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক পরিচলন ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। এই

কারণেই বাতাসে বিষাক্ত বস্তুর পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে গিয়ে এই অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।

শুধু ইংল্যাণ্ডই নয়, পৃথিবীর আরো বহু শিল্পোন্নত দেশই কম বেশি আবহাওয়া দূষণের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এইসব দেশের মধ্যে আছে বেলজিয়াম, মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। টোকিও, ইয়োকোহামা এবং নিউ অরলিয়নস্-এর মত বড় বড় শহরে এক অদ্ভুত ধরনের রোগ দেখা দিয়েছে যা সাধারণ হাঁপানীর ওষুধে নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে না। দেখা গেছে, এইসব রোগীদের শহরের শিল্পাঞ্চল এলাকার বাইরে নিয়ে এলে তাদের অনেকটা সুস্থ রাখা যায়। শহরের শিল্পাঞ্চলের দূষিত বায়ু ক্রমাগত শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করার ফলেই যে এই ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমাদের দেশের বড় বড় শহরগুলিতেও আমরা আবহাওয়া দূষণের বিষময় ফল কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছি। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টজনিত রোগের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আমাদের কলকাতা শহরের কথাই ধরা যাক। নিশ্চয়ই অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আজ-কাল শীতকালে সন্ধ্যাবেলায় শহরের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় এক শ্বাসরোধকারী ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। এই ধোঁয়াশায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং চোখ জ্বালা করে। কিন্তু কয়েক বছর আগেও এই ধোঁয়াশার অস্তিত্ব ছিল না। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে এখনই যদি আমরা সতর্ক না হই এবং পরিবেশ নির্মল রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন না করি, তবে কে বলতে পারে 1952 সালের লণ্ডনের মতো ভয়ঙ্কর খুনে ধোঁয়াশা কলকাতার বুকেও তার চরম আঘাত হানবে না?

জয়গোপাল রোড, জামসেদপুর-1

শুশুক

বিকাশকান্তি সাহা

'ডলফিন' (Dolphin) এই ইংরেজি শব্দটার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। বাংলায় আমরা যাদের 'শুশুক' বা 'শিশুক' বলে থাকি তারা কিন্তু ইংরেজিতে 'গ্যাঙ্গেটিক ডলফিন' (Gangetic Dolphin) নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নাম—প্ল্যাটেনিস্টা গ্যাঙ্গেটিকা (platanista gangetica)। সংস্কৃত সাহিত্যে এরা আবার 'শিশুমার' নামে পরিচিত।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ইত্যাদি নদীতেই শুশুকদের বসবাস। শুশুক কখনও সমুদ্রে প্রবেশ করে না।

এদের গায়ের রং অনেকটা ভূসা কালির মতো হয়ে থাকে। শুশুক দৈর্ঘ্যে প্রায় $7\frac{1}{2}$ থেকে $8\frac{1}{2}$ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে, স্ত্রী শুশুক পুরুষ শুশুকের তুলনায় লম্বায় একটু বড়ই হয়।

এদের মাথার দিকটা বেশ লম্বা। মুখের সামনের দিকটা চ্যাপ্টা ও সূঁচালো হয়ে চঞ্চুর আকার ধারণ করে। এদের প্রতি চঞ্চুতে 27 থেকে 32টা দাঁত থাকে। এদের মটর দানার মতো চোখগুলো বেশ ছোট আকৃতিরই হয়।

শুশুকদের লেজের দিকটাও চ্যাপ্টা—অনেক মাছের পুচ্ছ পাখনার মতো। জলে সাঁতার কাটতে একে হালের মতোই কাজে লাগায়। এমনিতে এরা খুব দ্রুতগতি সম্পন্ন প্রাণী। প্রায়ই জাহাজ লক্ষ্য করে মাইলের পর মাইল অক্লেশে সাঁতরে চলে যায়। অনেক নাবিকও প্রকৃতি বিজ্ঞানীর ডায়েরীতেই এরকম খবর ভূরি ভূরি মেলে।

শুশুকরা সাধারণতঃ দল বেঁধে থাকে না। এরা অনেকটা যাযাবর প্রবৃত্তিরও হয়ে থাকে।

এদের কিন্তু ফুসফুস থাকে। শ্বাসকার্য চালানোর জন্যে এরা কিছুক্ষণ পর পরই মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য জলে ভেসে ওঠে, আবার ডুবে যায়।

মৌসুমীবায়ু চলাকালীন মাসগুলোতে শুশুকেরা প্রায়ই জেলেদের জালে ধরা পড়ে। হাওড়ার মাছের বাজারের নাম নিশ্চয়ই অনেকেরই শোনা অথবা অনেকেরই চেনা। গত 1981 ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি হাওড়ার মাছের বাজারে একটা 2 কুইণ্ট্যাল ওজনের শুশুক বিক্রি হয়েছিল। শুশুকটা ধরা হয়েছিল গঙ্গা থেকে। 24 পরগণা জেলার বসিরহাটের এক মৎস্য ব্যবসায়ী এই শুশুকটাকে 620 টাকায় কিনে নেন। হাওড়া বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ীদের কাছে শুনেছি, এরকম নাকি প্রায়ই শুশুক বিক্রি হয়, এই বাজারে। তবে, বর্ষার সময়টাতেই বেশী।

জেলেরা শুশুক ধরার জন্য জাল, হারপূর্ণ (Harpoon) ইত্যাদি ব্যবহার করে। শুশুকের মাংস নাকি খুব সুস্বাদু। এদের শরীরে প্রচুর তেল থাকে। এই তেল ল্যাম্প জ্বালানোর কাজে কখনও কখনও ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া শুশুকের তেল থেকে নানা ওষুধও তৈরী হয়ে থাকে।

চলমান যাদুঘর

কিন্নর রায়

যাদুঘর নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে আসে মিশরের মমি, কোন প্রাচীন মূর্তি, আরও অনেক পুরনো কিছুমিছু। ফেলে-আসা দিনের আশ্চর্য সব স্মৃতিচিত্রমালা। অনেক দৌড়ে যাওয়া ঘোড়ার খুর-ছোঁয়া ধুলোর ঘ্রাণ।

অনেক, অনেকদিন আগের ঢালতরোয়াল, কামান-বন্দুক, ফসিল, ভাঙ্গা পাত্র, পাথরের টুকরো, হাতির দাঁত, ডাইনোসরের কংকাল সব মিলিয়ে সেই সব দিনের কতরকম জিনিসপত্র— যে দিন এখন আর নেই। অথচ ছিল কোন এক সময়ে। সবাই, সব কিছু মিউজিয়াম-বন্দী।

যাদুঘরের ঘরবাড়ি, বারান্দা ঘুরতে ঘুরতে অতীতকে ছোঁয়া যায় বার বার। মনে হয় এই তো সেদিন। মানুষ গুহা থেকে বেরিয়ে কাঁচা মাংস ছেড়ে আগুন জ্বাললো। কাপড় পরলো। চাষ শিখলো। তারপর কত রাজা মহারাজা। লড়াই যুদ্ধ বিদ্রোহ। ভেবে নিতে দোষ নেই, এই কদিন আগেই খুফুর পিরামিড তৈরী হলো। আর্যরা ভারতে এলেন। ভেঙে গেল সিন্ধু সভ্যতা। বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার করছেন। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক, তাঁর সঙ্গে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধ হচ্ছে। রোম সাম্রাজ্য তৈরী হলো। সীজার, অগাস্টাস, মহামহা সব সম্রাট। হানিবল আলপ্‌স পেরিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছেন। এথেন্স আর স্পার্টায় দারুন রেষারেষি। আলেকজান্দার ভারতে ঢুকে পড়ছেন।

যাদুঘরের এঘর ওঘর ঘুরতে ঘুরতে অনুভব করা যায় সেই প্রাচীন সব সভ্যতার সুর। যায় কোথায় যেন যাদুমালা। এ তো গেল যাদুঘরের ঘর-সমাচার। এখন যাদুঘর যদি বাসের ভেতর ঢুকে পড়ে। চারচাকায় গড়-গড়িয়ে গড়িয়ে যায়, বেড়িয়ে বেড়ায়, তা হলে কেমন মজা!

সঙ্গে সঙ্গে গালে হাত। ধ্যুস, তাই আবার হয় নাকি! সত্যি সত্যি এমন ব্যাপারও হয়। কলকাতা যাদুঘরের বাস আছে। তার পেটের ভেতরেই ভ্রাম্যমাণ যাদুঘর। 1969 সালের 14 এপ্রিল এ বাস চলতে শুরু করে। প্রথম যায় হুগলী। তারপর ঘুরে ঘুরে পশ্চিমবাংলার অনেক জায়গা। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, নতুনদিল্লী আর পাঞ্জাবের কোথাও কোথাও। বহু মানুষ এসেছেন বাসের কাছাকাছি। দেখে গেছেন ভেতরের জিনিস।

বাস ঘুরেছে ইস্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, মানুষের ঘর-গেরস্থালীর কাছাকাছি।

আঠাশটা শো-কেসের ভেতর আছে প্রাচীনতম মানুষের মডেল, যখন তারা পাথর ছুঁড়ে শিকার করত। আছে প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র, মহেঞ্জোদড়ো হরপ্পার স্নানাগার, ধৌলিতে পাহাড় কেটে তৈরী হাতি, পরিকল্পনা ছিল সম্রাট অশোকের। ভারহুতের বৌদ্ধস্তূপ, এই স্তূপের রেলিং, তক্ষশিলায় স্তূপ খুঁড়ে পাওয়া নানান মূর্তি, মথুরা থেকে কুষাণ যুগের যক্ষী গুপ্ত যুগের পাথর টিরা কেপির কাজ খাজুরাহের বিজয়নগর। আর পূর্বভারত থেকে পাওয়া বিভিন্ন জিনিস।

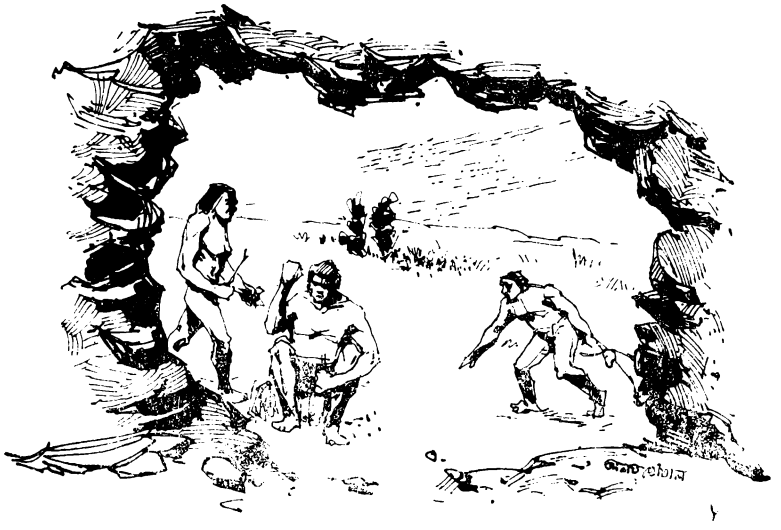

ফতেপুর সিক্রীর ইবাদত খাশর মডেল আছে এই বাসের মধ্যে। এখানেই আকবর দিন-ই-ইলাহী ধর্মপ্রচার করতেন। আরও কত কি!

এই তো ক'দিন আগে অনেক জায়গা বেড়িয়ে টেড়িয়ে ফিরলো এই যাদুঘরের বাস। 17 ডিসেম্বর পৌঁছলো উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে সাহিত্য আকাদেমির ময়দানে। তখন সাহিত্য আকাদেমির রজত জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদর্শনী হচ্ছে।

এখান থেকে বাস হাজির ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার স্টেট

মিউজিয়ামে। সেখান থেকে পুরী কলেজ। 26-28 ডিসেম্বর পুরী কলেজে দেখা গেল বাসটিকে। সেখানেও ভীড়। হৈ-চৈ। পয়লা জানুয়ারি কোনারক মিউজিয়ামে পৌঁছে গেল বাস। ওখান থেকে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজ হয়ে ময়ূরভঞ্জের বারিপদা।

বাস চলছেই।

পশ্চিমবাংলায় পৌঁছলো 15 জানুয়ারী। প্রথমে মেদিনীপুরের বোধরা হাইস্কুল। তারপর শ্রীকৃষ্ণপুরে। বাস গড়িয়ে চলে। বারুইপুর আঞ্চলিক মিউজিয়ামে চব্বিশ পরগণা প্রত্ন সম্মেলন হচ্ছে 22-30 জানুয়ারী। সেখানে বাস ঘিরে ভীড় আর ভীড়। পঞ্চাশ দিনের এই দুটি রাজ্য পরিক্রমায় 1600 কিলোমিটার চলেছে এই চলমান যাদুঘর।

এই সব তথ্য জানালেন কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরের এডুকেশন অফিসার শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী। শ্যামলবাবু বললেন, ভ্রাম্যমান যাদুঘরের এই প্রথম কলিঙ্গ বিজয়। এই বিজয় অভিযানের সময় বাসের ভেতর একটি শো-কেসে ছিল সম্রাট অশোক কলিঙ্গের পাহাড় কেটে যে হাতি তৈরী করেছিলেন তার মডেল। ওই পাহাড়ের গায়ে অশোক যে দ্বিতীয় শিলা অনুশাসন খোদাই করে-ছিলেন, তাতে লেখা ছিল যেখানে যেখানে যে গাছপালা যে ঔষধি নেই, তা অন্য জায়গা থেকে এনে লাগাও।

শ্যামলবাবু জানালেন, ভ্রাম্যমাণ যাদুঘর এখন পর্যন্ত ছাব্বিশ হাজার কিলোমিটার পথ গেছে। 26 লক্ষ মানুষ এখন অবধি এই চলাফেরা করা প্রদর্শনী দেখেছে। 1974 সালে এই বাসটি দীর্ঘতম যাত্রা করেছিল পশ্চিমবাংলা থেকে চণ্ডীগড়।

ওঁর কাছ থেকে শোনা গেল, চলাফেরা করা এ যাদুঘরের জিনিসপত্র কয়েকবার বদলেছে। কুষাণ যুগের কিছু মূর্তি বদলে অন্য জিনিস রাখা হয়েছে। বাংলার পাল ও সেন যুগের দুটো মূর্তির জায়গায় একটা রাখা আছে?

এভাবেই হঠাৎ হঠাৎ বেড়াতে বেরয় যাদু-বাস। এরকম চলাফেরা করা প্রদর্শনী-বাস আছে বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম, ব্যাঙ্গালোরের বিশ্বেশ্বরাইয়া সায়েন্স মিউজিয়াম এবং দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামের।

একদিন এই চলে-বেড়ানো যাদুঘরের মুখোমুখী হলে মন্দ কি?

1-A, মুখার্জিপাড়া লেন, কলি—26

স্বরহীন পাখি আর ডাকহীন কুকুর

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

মেক্সিকো থেকে আর্জেনটিনার মধ্যে এক ধরনের সারস পাখীকে দেখা গেছে যাদের গলার কোন স্বর-ই নেই। পাখী হয়েও এরা গান গাইতে বা ডাকতে পারে না। শুধু তাদের দুটো লম্বা চঞ্চু দিয়ে ঠক ঠক শব্দ করে। এদের বলা হয় (Jabiru) জ্যাবিরু।

এইরকম প্রকৃতিরই কিছু কুকুর আছে যাদের প্রথম জন্ম হয়েছিলো প্রাচীন মিশরে। বড়ো আশ্চর্যকর হলো এই সব কুকুরগুলো ঘ্যন্ ঘ্যন্ করে, নাকী সুরে কোঁ কোঁ করে ক্রুদ্ধ হয়ে গোঁ গোঁ করে কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে অন্য সব কুকুরদের মত ডাকতে পারে না।

এই ধরনের কুকুর গুলোকে বলে ব্যাসেন্‌জী Basenji (Buh-Sen-Jee)।

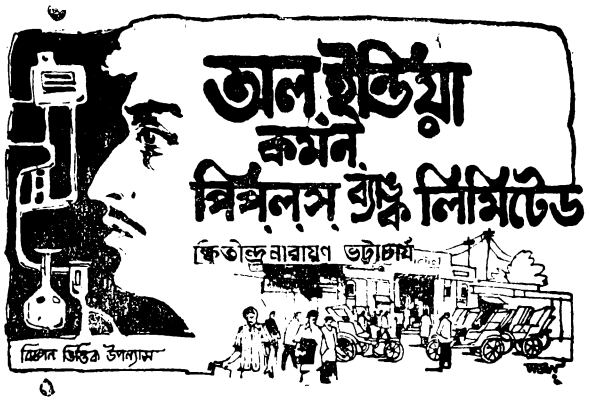

আগে যা ঘটেছে

রহস্যময়ভাবে মফস্বল শহরের একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। যে ব্যাঙ্কে সদ্য ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে এসেছে সুশান্ত। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেল বহু টাকা। এটা কি করে সম্ভব? স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, লকারের দুটো চাবির একটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেক্‌টিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে এলেন নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ কে. সি. ত্রিবেদী।

সতীনাথবাবু হঠাৎই এসে হাজির হয়েছেন সুশান্তকে কোন খবর না দিয়েই। তবে সুশান্তকে তিনি যে জিনিস দেখালেন, তাতে সুশান্তর চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। স্ট্রংরুমের আলমারীতে যে ছাপ পাওয়া গেছে, তা মানুষের হাতের ছাপ নয়—বানর জাতীয় কোন প্রাণীর!

নদীর ধার দিয়ে একটা বাঁধানো রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটছিলেন সুশান্ত ও সতীনাথবাবু। সূর্য তখনও ডোবে নি। এমন সময় মনে হলো, উলটো দিক থেকে একজন লোক এগিয়ে আসছেন। কাছাকাছি আসতে চেনা গেল তিনি ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজার মিস্টার ত্রিবেদী। গল্প করতে করতে তিনজনে খানিকক্ষণ এগিয়ে চললেন। ফিরতি পথে নদীর ধার ছেড়ে ওঁরা তিনজন শহরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। সতীনাথবাবু সুশান্তকে জানালেন, আরও দু দিন থেকে যাবেন।

॥ বারো ॥

মিঃ ত্রিবেদী অন্য রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবার পর সুশান্ত প্রফুল্ল মুখে বললো, "তা হলে কাকা, আজ তো আর যাচ্ছেন না?"

সতীনাথবাবুও সহাস্যমুখে বললেন, "না, থেকেই যাই। বারে বারে যাওয়া-আসা করার চাইতে 2/1 দিন থেকে যদি ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করা যায় তবে সেটাই ভালো নয় কি? একটা জরুরী কাজ ছিল বটে কলকাতায়, কিন্তু তা কোনরকমে ম্যানেজ করা যাবে। তারপর, সেটা চুকে গেলে, এখানে দরকার মত কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া এখানকার নদীর ধারটা সত্যিই লোভনীয়। বিকেলে ওর পাড় দিয়ে হাঁটলে ফুসফুসটা বিশুদ্ধ অক্সিজেনে ভরিয়ে নেওয়া যায়। কলকাতায় তো এখন ও জিনিস অতি দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।" বলেই আবার তিনি সশব্দে হেসে উঠলেন। তারপর একটু থেমে বললেন, "আর থেকে গেলে আর একটা বড় দরের নূতনত্বের আস্বাদ পেতে পারি। পুলিশের বড় কর্তার স্বরচিত কবিতা তাঁরই মুখ দিয়ে শুনতে পাওয়া! এ কি কম ভাগ্যের কথা?" এবং তারপরে আবার সেই-রকম হাসি।

একটু পরেই ওঁরা সুশান্তর কোয়ার্টার্সে এসে পড়লেন। সতীনাথবাবু বললেন, "আগে এক পেয়ালা গরম গরম কফি তো খাওয়া যাক্ তারপর কালকের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলব। তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পার, তবে সব জায়গায় নয়।"

কফি তৈরী হলো। দুজনে আরাম করে বসে সেই কফি সেবনের পর সতীনাথবাবু তাঁর ডায়েরীতে আগামী দু'-তিন দিনের প্রোগ্রাম লিখে ফেললেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সুশান্তকে বললেন, "কাল সকালে তুমিও আমার সঙ্গী হয়ো। তবে সর্বত্র তোমাকে নিয়ে যাব না, যখন দরকার মনে করব, তোমাকে না-চেনার ভান করব। চকিতে ছদ্মবেশ ধরার মেক্-আপ করার সরঞ্জাম তো আমার হাতেই থাকবে—এই অ্যাটাচি কেসে।"

পরদিন প্রাতরাশ সেরেই সতীনাথবাবু সুশান্তকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। চলতে চলতে হঠাৎ একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে সুশান্ত বললো, "এইটে আমার বন্ধু সেই সরযূপ্রসাদের বাড়ি। এ কি ওপরের জানালাগুলো যে সব খোলা দেখছি! এতদিন তো ওগুলো সব বন্ধ ছিল। তবে কি তবে কি সরযূপ্রসাদ ফিরে এসেছে?"

একটা আশার আলো সুশান্তর চোখেমুখে ভেসে উঠলো। সতীনাথবাবু বললেন, "তাই নাকি? তা হলে তো

তোমার সেই বন্ধুর সঙ্গে একটু আলাপ করে যাওয়া যেতে পারে।"

দু'জনে ধীরে ধীরে বাড়িটার সদর দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কোন কলিং বেল-টেল নেই, কিন্তু দরজায় দেশী কলিং বেল অর্থাৎ একজোড়া কড়া ঝুলছে। সুশান্ত সেই ধরে নাড়তে লাগলো।

একটু পরেই ভিতর থেকে দরজার হুড়কো খোলার শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই একজন লোক দরজার পাল্লা দু'টো ঈষৎ ফাঁক করে মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কোন হ্যায় ?"

সুশান্ত হঠাৎ তাকে চিনতে পারলো না। লোকটির মাথা সম্পূর্ণ কামানো, শুধু ব্রহ্মতালুর ওপর একগুচ্ছ চুল টিকি হিসেবে রয়ে গেছে। সুশান্ত তাকে চিনতে পারলো না, কিন্তু লোকটি চিনলো। এবার ভাঙ্গা বাংলায় বললো, "সুশান্ত্ বাবুজী, আপনি ?"

চেহারা চিনতে না পারলেও সুশান্ত এবার গলার স্বরটা ঠিকই চিনতে পারলো। একটু অবাক্ হয়ে বললো, "আরে তুমি! তা মাথা কামিয়েছ কেন ? অমন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল ছিল!"

সতীনাথবাবু লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার মা-বাবা এঁরা কি কেউ—?"

লোকটি লজ্জিত হয়ে জানালো, না না, সেরকম কিছু ঘটে নি। তাদের গ্রাম সম্পর্কে এক বুড়ো চাচা মারা গেছেন, তাই ও মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছে। শুধু ও নয়, ওদের গ্রামের অন্যান্য সকলেও ন্যাড়া হয়েছে।

"গাঁ শুদ্ধু সবাই একসঙ্গে ন্যাড়া হয়েছে! বল কি ?"

লোকটি আবার তেমনি সলজ্জভাবে বললো, "হামার দেশে ওহি রকম আছে।" অর্থাৎ গাঁয়ের কোন একজন মারা গেলে গাঁ শুদ্ধু আত্মীয়স্বজন মাথা কামিয়ে অশৌচ পালন করে।

সতীনাথবাবু সুশান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই হচ্ছে সত্যিকার সাম্যবাদ। উঁচু-নীচু, ছোট বড় সব এখানে সমান। বড় লোক গরীব লোক সকলের জন্যেই সমান ব্যবস্থা। এখানে সভা করে, মাইকের সামনে বক্তৃতা দিয়ে, ঝাণ্ডা উড়িয়ে সাম্যবাদ প্রচার করতে হয় না—অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে।'

লোকটি কি বুঝলো কে জানে। সে শুধু বললো, "জী হুজুর।"

বলা বাহুল্য লোকটি সরযূপ্রসাদের পুরোনো চাকর। সরযূপ্রসাদ বাইরে কোথাও চলে গেলে এরই ওপর বাড়ির ভার দিয়ে যায়। লোকটি বিশ্বাসী।

সুশান্ত একবার সতীনাথবাবুর দিকে ফিরে বললো, "একে আমিও খুব ভালো করে চিনি, কিন্তু কি আশ্চার্য দেখুন মাথার চুল ফেলে দিতেই যেন একেবারে অন্য চেহারার মানুষ হয়ে গেছে!

সতীনাথবাবু কোন উত্তর না দিয়ে স্বভাবসুলভ মৃদু হাসতে লাগলেন।

সুশান্ত লোকটির দিকে আবার ফিরে তাকালো। বললো, "তোমার বাবু বুঝি ফিরে এসেছেন বাবুলাল!"

লোকটির নাম বাবুলাল। সে বললো, "কই, না তো! তিন-চার মাহিনা হইয়ে গেল, সাহেব না দিলেন একটা খোবোর, না একটা চিট্ঠি!"

"তা হলে ওপরের জানালাগুলো সব খোলা দেখছি যে!"

বাবুলাল জানালো, এটাও সাহেবের একটা নির্দেশ। কয়েকদিন পর পরই দরজা-জানালাগুলো খুলে দিতে হবে ঘরে রোজ ঢুকবার জন্যে আর মেঝেটেবিলও ঝাঁটপাট দিয়ে ছিমছাম করে রাখতে হবে, যাতে সে যখন ফিরে আসবে তখন যেন নতুন করে সারা বাড়ি ধোয়াপোঁছা করতে না হয়। সরযূপ্রসাদের নাম বলতে গেলে বাবুলাল তাকে সম্ভ্রম দেখাবার জন্যে বাবু না বলে সাহেবই বলে। সাহেব তো বটেই! যে লোক কথায় কথায় বিলেত চলে যায়, অমন তোফা ইংরেজি বাৎ বলে সে সাহেব না তো কি ?

"তা তোমাকে এভাবে আর কতদিন থাকতে হবে বাবুলাল ?" সুশান্ত আবার প্রশ্ন করলো।

"তা কেমোন কোরে বলবো ? আপনি তো সাহেবের দোস্ত্। সাহেবের হালচাল সোবই জানেন। হঠাৎ একরোজ আসিয়ে যাবেন। তা সে কালভি হতে পারে, ফিন্ দু'মাহিনা বাদভি হতে পারে। তবে আসিয়ে যাবেন ঠিকই।"

সতীনাথবাবু এবার কথা বললেন। বললেন, "তোমার সাহেব এখানে নেই, নইলে ভিতরে গিয়ে দেখে আসা যেত কেমন ছিমছাম্ রেখেছ বাড়িটা। আমি তো উটকো লোক, কিন্তু ইনি তো তোমার সাহেবের দোস্ত, ওঁর তো একটু কৌতূহল হতে পারে।"

বাবুলাল সঙ্গে সঙ্গে বললো, "বাবুলাল কাম-মে ফাঁকি দেয় না—কব্ভি নেহি।" তারপর সুশান্তর দিকে চেয়ে বললো, "চলিয়ে না, দেখে লিবেন বাবুলাল ক্যায়সা কাম কোরে।" বলেই সে সুশান্তকে ভিতরে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালো।

সতীনাথবাবু বললেন, "তা যাও না তোমার সাহেবের দোস্তকে নিয়ে ভেতরে। আমি বরঞ্চ এখানে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করি।"

লোকটি দরজাটা এবার সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে সুশান্তকে বললো, "চলিয়ে সুশান্তবাবু। সাহেব এলে তাঁকে বোলে দিবেন বাবুলাল কামরা-উমরা কেমোন সাফসুফ রাখিয়েছে।" তারপর সতীনাথ বাবুর আপাদমস্তক একবার ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বললো, "আপ্‌ভি চলিয়ে আসুন। আপ্‌ তো উনকো সাথ আয়। কৌন হোতা উসকো? চাচা?"

সতীনাথবাবু একটু ইতস্তত ভাব দেখিয়ে বললেন, "আমিও যাব? আমি তো বাইরের লোক। আচ্ছা, যখন বলছ, একবার ঘুরেই আসি। রাস্তায় আর কতক্ষণ একা একা অপেক্ষা করব?"

তিনজনে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেন। বাবুলাল মিছে কথা বলে নি, সত্যিই সে বাড়িটা ঝাড়পোঁছ করে বেশ ঝকঝকে রেখেছে। জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর রোদ লুটিয়ে পড়ছে জানালা সব খুলে রেখেছে বাবুলাল।

সুশান্ত এ বাড়িতে আগেও এসেছে, কিন্তু সে শুধু বসবার ঘর ড্রইং রুমে বসেই কাটিয়েছে, এমন ঘুরে ফিরে দেখে নি কখনও।

সরযূপ্রসাদের শোবার ঘরটিও দেখবার মত। অনর্থক কতকগুলো ফার্নিচার বোঝাই করে ঘর সাজানো হয় নি, একটা স্প্রিং-এর খাট, তার ওপর নরম গদী, তোষক একটা বেশ রঙচঙে সুজনি দিয়ে ঢাকা রয়েছে। খাটের পাশে একটা দোতলা টিপয়, তার নিচের তাকে কয়েকটা সাময়িক-পত্র তখনও সাজানো, ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী তিন ভাষায় ছাপা কাগজই রয়েছে তার মধ্যে। টিপয়ের ওপরে একটা টেলিফোন, জলের গেলাস। ব্যস্‌, আর কিছু না। দেয়ালে একটা ঘড়ি তখনও টক্‌ টক্‌ করে চলছে। বোঝা গেল বাবুলাল যে শুধু নিয়মিত ঘরই পরিষ্কার করে তা নয়, প্রতি সপ্তাহে দেয়াল ঘড়িটাতেও দম দিয়ে রাখে।

সতীনাথবাবু দেখেশুনে তারিফ করে বললেন, "বাঃ, বেশ তো রেখেছ ঘরটা! তোমার সাহেব এখানে নেই, তবুও বুঝবার উপায় নেই তা ঘর দেখে। ও-দরজাটা কিসের? ওটা বোধ হয় অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুম? বাঃ বাঃ। আরেঃ, এটা কি লেগে রয়েছে দরজায়? হাতটা নোংরা হয়ে গেল যে!

তোমাদের নিচের তলায়ও বাথরুম আছে নিশ্চয়? হাতটা একটু বেসিনে ধুয়ে নেব।"

বাবুলাল বলল, হ্যায় তো জরুর। লেকিন ঐসা তখলিফ কেনো কোরবেন? এহি গোসলখানামে চলিয়ে যান না!"

"যাব? এখানেই?" একটু কিন্তু কিন্তু ভাব দেখিয়ে সতীনাথবাবু অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। কি মনে করে সুইচ্‌টা টিপে আলো জ্বালিয়ে বাথরুমের দরজাটাও ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। তারপর মিনিট খানেক পরে আবার বেরিয়ে এলেন একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

নিচে নেমে এসে বাবুলালকে আরও একবার তারিফ করে ওঁরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করলো, "এবার কোথায় যাবেন?"

"যাবার তো কয়েকটা জায়গাই আছে। চল, আগে পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে দেখাটা করে আসি, কোন নতুন খবর হয়তো পাব না, তবে ওঁর স্বরচিত কবিতাগুলো ওঁরই মুখে শুনে নেওয়া যাবে। কবিতা শোনাবার জন্যে উনি যেমন আঁকুপাঁকু করছিলেন তা দেখে সত্যিই মায়া লাগছিল।"

"তা হলে আমি অন্য কোথাও গিয়ে অপেক্ষা করি। আমার তো বোধ হয় ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না?"

কেন হবে না? সবাই না জানলেও ওঁরা তো জানেন যে তোমার দৌলতেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। যদিও কাজটা সম্পূর্ণ পুলিশেরই করার কথা, কিন্তু ওঁরাও আমার সাহায্য পেলে খুশি হবেন বলে জানিয়েছেন। শখের গোয়েন্দাগিরিতে আমার বোধ হয় একটু নামটাম হয়েছে, অন্ততঃ ওঁদের ধারণা। এভাবে সরকারী পুলিশের সঙ্গে একত্র হয়ে রহস্য উদ্ধারের কাজ আমি আগেও কয়েকবার করেছি এবং বলতে বাধা নেই, সবগুলোতেই সাফল্য লাভ করেছি। কাজেই এখানকার ওঁরাও আমাকে সঙ্গে পেয়ে খুশি হয়েছেন। তোমার তাই আমার সঙ্গে যেতে বাধা কি?"

"একটু দূর আছে, চলুন একটা সাইকেল-রিক্স ধরে নিই।"

রিক্স এসে থানায় বড়কর্তার কোয়ার্টার্সের সামনে দাঁড়ালো। এ সময়টা তিনি বাড়িতেই থাকেন, অফিস-ঘরে গিয়ে বসতে বেশ একটু দেরী হয় তাঁর। অবশ্য তাঁর অনুপস্থিতিতে সম্ভবতঃ কাজের কোন ত্রুটি হয় না। কারণ ছোট কর্তা থাকেন। তিনি তো একাই একশ'। তা ছাড়া অফিস-টফিস ব্যাপারে তিনি খুব নিয়ম মেনে চলেন, যাকে বলে "ওভার পাংচুয়াল"। তাঁর শুধু দুঃখ, বড়কর্তার

মত একটি "হাঁদা" লোক হচ্ছে তাঁর ওপরওয়ালা। কিছু বলাও চলে না তাঁর সামনে।

বড়কর্তা সতীনাথবাবুকে দেখে খুশিতে ফেটে পড়লেন। তারপর সুশান্তর দিকে চেয়ে বললেন, "ভালো আছেন তো? আরও কিছুদিন একটু জ্বালা সইতে হবে আপনাকে, তবে সতীনাথবাবু স্বয়ং যখন আসরে নেমেছেন তখন আর ভাবনা নেই।"

ক্রিমিনালদের হদিশ বার করতে।"

"বসুন, আগে একটু চা-টা খেয়ে নিন। চা না খেয়ে নিলে কি কবিতা জমে? অফিসের কথা ভাবতে হবে না। ও ছোটবাবু আছেন, উনিই সব কিছু ম্যানেজ করতে পারবেন। বরঞ্চ আমি গিয়ে ওঁর কাজে হস্তক্ষেপ না করলেই বোধ হয় উনি খুশি থাকবেন।"

'চা' এল। সঙ্গে কিছু 'টা'ও। তারপর বড়কর্তা

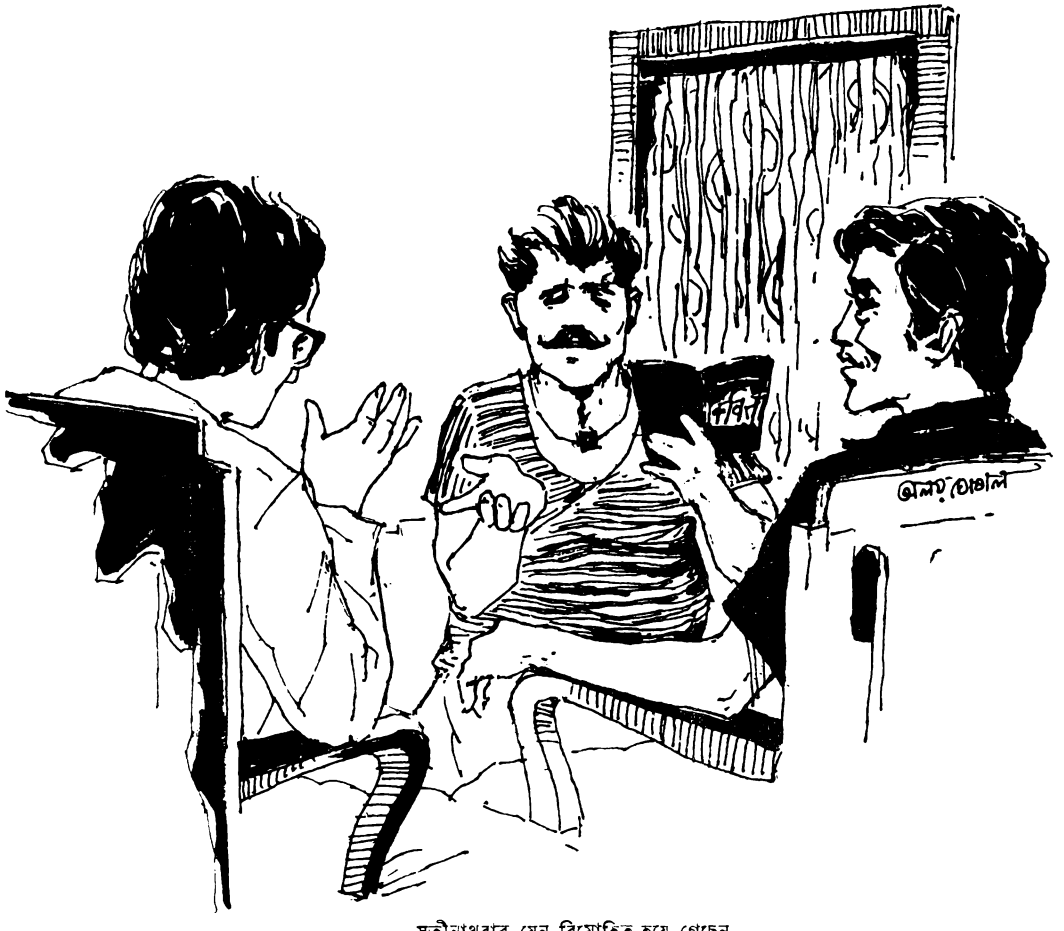

.....সতীনাথবাবু যেন বিমোহিত হয়ে গেছেন

সতীনাথবাবু সুশান্তর দিকে অলক্ষ্যে একটু চোখ টিপে মুচকি হেসে বললেন, "ওঁকে ধরে নিয়ে এলাম। উনিও কবিতা ভীষণ ভালোবাসেন, নিজে তেমন লিখতে পারেন না, কিন্তু কবিতার রসগ্রহণ করতে পারেন ঠিকই। আর ভালো কবিতা হলে তো কথাই নেই! যাক, এবার বার করুন আপনার কবিতা। আপনাকে তো আবার এখনই অফিসে ছুটতে হবে যত রাজ্যের চোর-ডাকাত, ছিঁচকে

ড্রয়ার খুলে একটা মস্ত খাতা টেনে বার করলেন। বুঝতে কষ্ট হলো না এই খাতাটিকেই তিনি আপাততঃ তাঁর কাব্যরসে সিক্ত করে রেখেছেন।

কবিতাগুলি হিন্দীতে। ঠিক হিন্দী নয়, খানিকটা মৈথিলী ভাষারও প্রভাব আছে তার মধ্যে। অবশ্য বড়কর্তা বললেন, তিনি বাংলাও বেশ বোঝেন কিন্তু ভালো বলতে পারেন না—"জবানসে নেহি আতা।"

চললো কবিতা পড়া। একটার পর একটা। নেহাৎ হিন্দীতে লেখা, তাই এখানে সেগুলি তুলে দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু তার মধ্যে হেন জিনিস নেই যাকে তিনি কাব্যরসে না নিয়েছেন। সেই প্রাচীন আর্ষঋষি থেকে শুরু করে এযুগের লম্বা চুল, মেয়েদের জামার মতো নানা বাহারী রঙের বুশ্‌শার্ট গায়ে আধুনিক ছোকরা, জিন্‌স্‌ পরা আধুনিক তরুণী সকলের সম্বন্ধেই কিছু কিছু লেখা আছে তাতে। তা ছাড়া আছে সাম্যবাদ, ফ্যাসীবাদ, রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, আমলাতন্ত্র, সিনেমাতন্ত্র—আরও কত কি! সুশান্তর হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু সতীনাথবাবু যেন বিমোহিত হয়ে গেছেন এই ভাব দেখিয়ে শুনে চলছিলেন আগাগোড়া, আর মাঝে মাঝে 'বাঃ', 'কেয়াবাৎ', 'জিতা রাহো', 'সাধু সাধু' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে কবিকে উৎসাহিত করছিলেন।

অবশেষে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটবার পর বড়কর্তার খেয়াল হলো যে, এইবার অফিস-ঘরে গিয়ে বসা দরকার। অত্যন্ত অনিচ্ছায় খাতা বন্ধ করে তিনি বললেন, "আজ এই পর্যন্ত থাক, যদি মেহেরবানী করে আর একদিন আসেন তা হলে বাকিগুলো থেকেও বেছে বেছে কিছু শোনাব। আপনারা এখন কোন্‌দিকে যাবেন? চলুন, একসঙ্গেই বেরুনো যাক, পোশাকটা একটু বদলে আসি।"

"আসুন" বলেই সহসা কি মনে করে সতীনাথবাবু বললেন, "দাঁড়ান, আর একটা কাজ আছে আপনার কাছে। এটারও একটা ফিঙ্গার প্রিণ্ট চাই। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করবেন। আমি বরঞ্চ আরও দু'দিন এখানে অপেক্ষা করব, কিন্তু ওটা চাই-ই।" বলে তিনি অতি সন্তর্পণে পকেট থেকে প্যাকেটে মোড়া ছোট্ট একটা জিনিস বড় কর্তার হাতে তুলে দিলেন। বললেন, "সাবধানে রাখবেন। আর, আপনাকে বলা নিষ্প্রয়োজন, প্যাকেটের ভিতরটায় হাত লাগাবেন না। কবে পাব ফিঙ্গার প্রিণ্টটা?"

"কালই বিকেলে পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমি এখনই আসছি, চলে যাবেন না কিন্তু?" বলে বড়কর্তা পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন। বোধ হয় জামাকাপড় বদলাবার জন্যেই।

(ক্রমশঃ)

খুদে বৈজ্ঞানিক / দিলীপ দাস

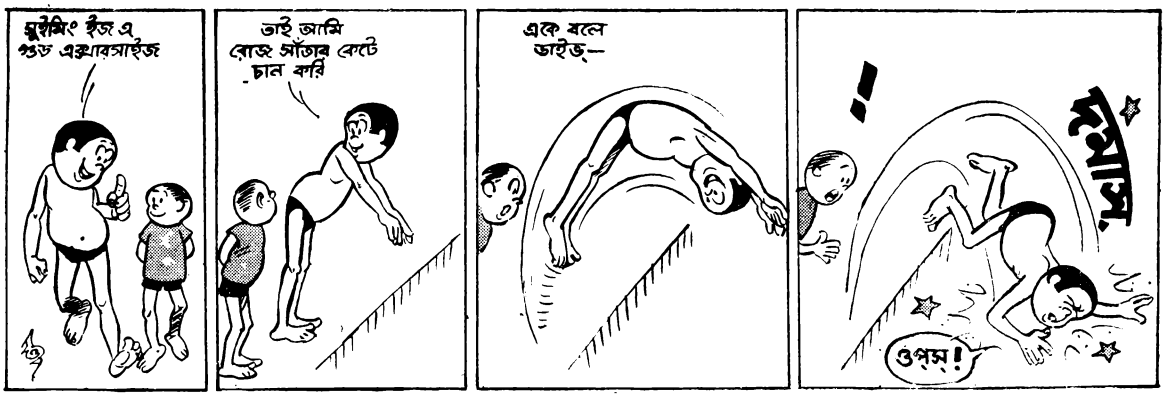

খোস-চুলকানি

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জীবজগতের ছোট বড় বহু প্রাণীই মানুষের দেহে আশ্রয় নেয়। মানবদেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন যাপন করে। এদের বলা হয় পরভোজী। এরাই আবার অকৃতজ্ঞের মতো মানবদেহে ব্যাধির সৃষ্টি করে। বহু চর্ম রোগও পরভোজী প্রাণীর আক্রমণে ঘটে থাকে। একটি খুব সাধারণ চর্মরোগ হলো খোস বা চুলকানি। চিকিৎসকরা বলেন স্কেবিজ (Scabies)। এর প্রধান লক্ষণ হলো ছুলকানি এবং ছোট ছোট গুটি বা ক্ষত। ক্ষত মুখ থেকে রস বেরিয়ে একটা আস্তরণের মতো পড়ে। কখনো বা ছোট ছোট মুক্তাদানার মতো দেখা যায়। এই গুটিগুলির কারণ হলো একরকম অতি ক্ষুদ্র পরভোজী কীটের আক্রমণ। এই কীটগুলি একজন রোগীর শরীর থেকে আর একজন রোগীর গায়ে আশ্রয় নেয়। অথবা কিছু গৃহপালিত পশু বা পাখির গা থেকেও আসতে পারে। এ পরভোজীর নাম হলো অ্যাকেসার স্কেবিই। এদের আয়তন খুবই সূক্ষ্ম ($\frac{1}{3}$-$\frac{1}{4}$ মিঃ মিঃ)। স্ত্রীকীটগুলি সাদাটে দানার মতো দেখতে। পুংকীটগুলি কিন্তু মাপে এর অর্ধেক। পূর্ণাঙ্গ কীটগুলি চতুষ্পদ। স্ত্রীকীটগুলি ত্বকের কঠিন স্তরের ঠিক নিচে গর্ত করে ঢুকে গিয়ে বাস করে। সেখানে ডিম পাড়ে এবং মল ত্যাগ করে। এই কার্যটি করে বিশেষ করে রাত্রিকালে। ঐ ডিমগুলি বৃদ্ধি পেয়ে শূকে পরিণত হয় এবং ত্বকের উপর ঘুরে ফিরে বেড়ায় এবং ক্রমশ পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। এদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী কীটগুলি পুনরায় ত্বকের ভিতর ঢুকে গিয়ে বাসা করে। এই প্রক্রিয়ার কালেই ত্বকের প্রদাহ সৃষ্টি হয়, গুটি বের হয় এবং চুলকানি হয়। চুলকানির ফলে ত্বক ছিঁড়ে গিয়ে ক্ষতের মুখগুলি রক্ত বিন্দুর মতো দেখায়। চুলকানিটা রাত্রিকালেই বেশি মাত্রায় হয়। চুলকানির ক্ষতে অন্যান্য জীবাণুর আক্রমণে বিষিয়ে যায় এবং ক্ষতস্থান গুলি পেকে গিয়ে আকারে বৃদ্ধি পায় তখন কতকটা ফোঁড়ার মতো দেখায়। চুলকানির ক্ষতগুলি সাধারণ শরীরের কয়েকটা বিশেষ জায়গায় দেখা যায়। হাতের আঙুলের খাঁজে। কবজির কাছে, জননেন্দ্রিয়ে, পাছায় বগলের কাছে। শরীরের অন্যান্য অংশেও হয় না এমন কথা, অবশ্য নয়।

খোস চুলকানি দেখা দিলেই যথাসম্ভব সত্বর চিকিৎসা করিয়ে সারিয়ে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন কারণ এটি সংক্রামক ব্যাধি। আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি যাঁরা থাকেন তাঁদেরও ছোঁয়াচ লাগার খুবই সম্ভাবনা, বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের। এক সঙ্গে খেলা করা, এক বিছানায় শোওয়া, এক গামছা ব্যবহার করা সংক্রামণের প্রশস্ত পথ। এইসব ছোঁয়াচ থেকে বয়স্করাও বাদ পড়ে না। সাধারণত নিম্নবিত্তদের মধ্যে এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব বেশি কারণ তাদের বাসযোগ্য স্থানের অভাব, সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কম জ্ঞান এবং আর্থিক কারণে পরিছন্ন পরিবেশে থাকার সুযোগ কম। তা বলে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে এরোগ হয় না বা হবে না তা কিন্তু নয়।

এব্যাধি একবার হলে তাকে সারানো খুবই মুশকিল। প্রথমত এরোগের কীটগুলি জামা কাপড় বালিশ বিছানা প্রভৃতিতে ছড়িয়ে থাকে। দেহের কীটনষ্ট করা হলো, কিন্তু পরিবেশের কীটগুলি আবার তাকে আক্রমণ করলো। এ ছাড়া একাধিক ব্যক্তির এ রোগ থাকলে কোনো একজন নিরাময় হলেও পরিবারের অন্য ব্যক্তির ছোঁয়াচ লেগে তিনি পুনরায় আক্রান্ত হন। এই খোস বা চুলকানিতে অনেকেই বহুদিন যাবত ভোগেন। নিরাময়ের উপায় হলো পরিবারের সকলেই এককালে চিকিৎসা করাবেন এবং ব্যবহৃত পোষাক বিছানা ইত্যাদি বাড়িতে গরম জল দিয়ে কাচতে হবে অথবা ধোপার বাড়িতে দিতে হবে।

25-A নিমতলাঘাট স্ট্রীট, কলি—6

তিন পেয়ে, না চার পেয়ে?

অরূপরতন ভট্টাচার্য

তিন পায়া টেবিল না চার পায়া টেবিল?

একটা তিন পায়া টেবিল মেজের উপরে ভালভাবে বসবে, না চার পায়া টেবিল?

পায়া যার বেশি হবে, বুদ্ধি যেন বলে, সেই রকম জিনিসই মেজের উপরে বসে ভাল। টেবিলের এক পায়ায় চাপ পড়লে অপর পায়া উঠে যায়, ছেড়ে দিলে নেমে আসে। এরকম ব্যাপার অনেকেই দেখেছে। আলমারির বেলাতেও তাই। চার পায়া চৌকিগুলোও ও-রকম—মেজের উপরে ঠিকমতো বসানোর জন্যে কত সময়ে যে ভাঁজে ভাঁজ কাগজ গুঁজে দিতে হয় পায়ার নিচে।

বিচ্ছিরি লাগে!

কিন্তু উপায়ই বা আর কি!

অথচ পায়ার সংখ্যা কম নয়, চার। মন বলে, মেজের উপরে চার পা-ওলা টেবিল, আলমারি, চৌকি যদি ভাল-ভাবে না বসে তাহলে কি আর তিন পায়া টেবিল, চেয়ার, চৌকি ঠিকমতো বসতে পারে?

শুনলে অবাক হওয়ার কথা! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, পারে। তিন পায়া চৌকি দেখা যায় না। তিন পা-ওলা আলমারিও নয়। কিন্তু তিন পা-ওলা টেবিল আছে। সে টেবিল কেবল সখের জন্যে নয়। সখও বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা। তিন পেয়ে টেবিলে ঢেঁকির মতো মেজের উপরে কখনো এক পায়ায় ভর করে ওঠা বা নামা—এমন হবে না। এরকম আসবাব মেজের উপরে বসবে ভালভাবেই আর ভাঁজ করা কাগজের সাহায্য না নিয়েই।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে, একটা চার পেয়ে টেবিল, আলমারি বা চৌকির একটা পায়া ভেঙ্গে দিলে তা সুন্দরভাবে বসবে মেজের উপরে। তখন তা সোজা না থেকে নিশ্চয় হুড়মুড় করে উলটে পড়বে। এক পাশেই তিনটে পা, তবু তা ভর সামলাবে, এমন তো হয় না। হওয়ার কথাও নয়। পায়া তিনটে এমনভাবে থাকবে যাতে টেবিল, আলমারি আর চৌকি ভর সামলানোর ক্ষমতা রাখে!

কেন তিন পায়া টেবিল মেজের উপরে ভালভাবে বসে চার পায়া টেবিলের চেয়ে?

তার কারণ বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

দুটো বিন্দু দিয়ে যেমন আঁকা যায় একটা নির্দিষ্ট সরল রেখা, তিনটে বিন্দুতে তেমনি একটা নির্দিষ্ট সমতল। তিনের চেয়ে কম বিন্দুতে চলবে না। বেশি বিন্দুতেও নয়।

কমে নয় কেন বোঝা যায়। তিনের চেয়ে কম পা-ওলা কোনো কিছু কি বসে মেজের উপরে?

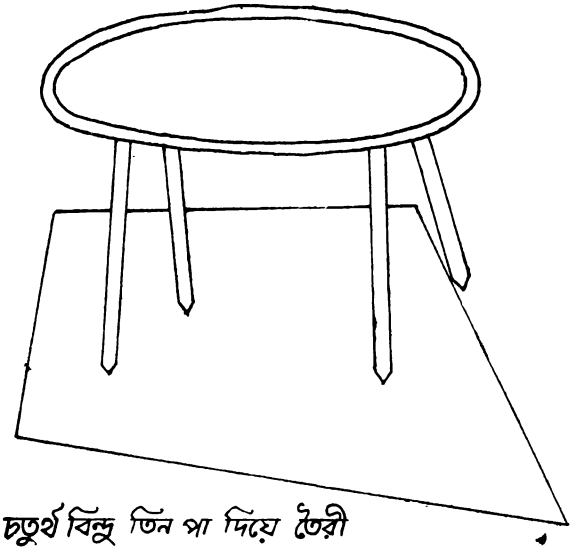

চতুর্থ বিন্দু তিন পা দিয়ে তৈরী তলের উপরে না থাকলেই মুশকিল!

বেশির বেলায় ভয় আবার অন্য ধরনের। যে কোনো তিন পায়ের তিন বিন্দু যে সমতল তৈরি করছে, চতুর্থ বিন্দুটি যদি ঠিক সেই তলের উপরে না থাকে!

কখনো কখনো হয়ও তাই। যেখানে চেয়ার, টেবিল, চৌকি ভালভাবে বসছে না, সেখানে চারটে পায়া এক তলে নেই বুঝতে হবে। এখানে অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের মতো বেশি পায়ায় অসুবিধে। তিনটে বিন্দুর মতো তিনটে পায়াতে যে নির্দিষ্ট তল, চতুর্থ বিন্দু থেকে যাচ্ছে সে তলের বাইরে।

তা হলে কোন্ টেবিলকে বেশি পছন্দ করবো?

চার পায়া টেবিলকে, বা তিন পা-গুলাকে?

103/E কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-29

বিজ্ঞানের ভেল্কি

কফির গ্লাসে তুফান

এ. সি. সরকার

বেলজিয়ামের একটি সুন্দর শহর নাম ওসটেণ্ড। সেবার শীতকালে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সেখানে ইংল্যাণ্ড আর ফরাসী দেশ পরিক্রমা শেষ করে। অধিবাসীরা ম্যাজিকের খুব ভক্ত আর আর্টের সমঝদার।

কর্মকর্তাদের সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম মজলিশের জায়গায় এক রবিবারের সকালে। প্রশস্ত হলঘর। এক প্রান্তে একটা লম্বা টেবিল আর দুটো চেয়ার পেতে রাখা হয়েছে আমার জন্যে। বাকি অংশে সাজানো রয়েছে কচিকাচা দর্শকদের জন্যে সারি সারি চেয়ার।

কথাবার্তা হলো। তারপরেই ছোটদের কাছ থেকে অনুরোধ এলো—একটা ম্যাজিক দেখাতে হবে। প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। এক মজাদার কফির ম্যাজিক দেখিয়ে অবাক করে দিলাম সবাইকে। আমার নির্দেশে আমার সহকারী ট্রেতে করে নিয়ে এলে কাচের গেলাসে করে প্রায় এক গ্লাস কফি। ট্রের অন্য পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল একটা কাগজ মুড়িয়ে বানানো চানাচুরের ঠোঙার মতন ঠোঙা।

কফির গ্লাসটা হাতে ধরে উঁচু করে সবাইকে দেখিয়ে বললাম 'কফি আমার তেমন প্রিয় নয়। আমার সব চেয়ে প্রিয় পানীয় হচ্ছে সাদা-মাঠা জল: ঠাণ্ডার দেশ, তাই আমার সহকারী বুদ্ধি করে আমার জন্যে কফি নিয়ে এসেছে —বেশ কড়া, গরম গরম কফি।'

আমার কথা শেষ হতেই আমায় সহকারী নীরবে মাথা নাড়িয়ে সায় দিল আমার কথায়।

কফির গ্লাসের দিকে নজর দিয়ে আবার বলা শুরু করলাম ঃ 'নানা দেশের কফিই তো খেলাম দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে। এবার দেখা যাক বেলজিয়াম দেশের কফির কী মাহাত্ম্য।'

কথা বলতে বলতে আমার নজর পড়ে ট্রের উপরে দাঁড় করানো কাগজের ঠোঙাটার দিকে। ঠোঙার চওড়া দিকটা ট্রের উপরে ঠেকানো আর সরুদিকটা উপরে—বিয়ের টোপরের মতো দাঁড়িয়ে আছে ঠোঙাটা ট্রের উপরে।

আমি সহকারীকে প্রশ্ন করি ঃ 'কফি এনেছ, বেশ করেছ। কিন্তু এই ঠোঙা কেন?' সঙ্কোচের সঙ্গে উত্তর দেয় সহকারী ঃ 'পাশের ঘরে পড়ে ছিল, নিয়ে এলাম। যদি কোন কাজে লাগে আপনার, তাই।'

'কফি খাওয়া আর হলো না আমার দেখছি। শেষ পর্যন্ত কফি দিয়ে ম্যাজিকই করতে হবে এবার।'

কথা শেষ করে আমি কফির গ্লাসটা নামিয়ে রাখি ট্রের উপরে। তারপর ঐ ঠোঙাটা তুলে এনে তা দিয়ে কফির গ্লাসটা ঢাকা দিয়ে শুরু করি ম্যাজিকের মন্ত্র—

মন্ত্র পড়ার তালে তালে আমার সহকারী ট্রে-টা নাড়াতে থাকলো আর আমিও সেই তালে তালে নাড়াতে থাকলাম ঠোঙাটাকে হেলিয়ে দুলিয়ে। মন্ত্র পড়া শেষ হতে ঠোঙাটা তুলে নিলাম যাদুকারী চালে। সকলে অবাক হয়ে দেখলো মন্তরের গুণে (!) কফি জল হয়ে গেছে—টলটলে নির্মল জল। গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম সবাইকে। মন্ত্র বলে চোখের পলকে এক গ্লাস কফি সবার চোখের সামনে জল হয়ে যেতে সবাই এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে আমাকে অভিনন্দিত করলেন। কচি কণ্ঠের কল-হাসিতে ভরে উঠলো ঘরের চার দিক।

মন্তরে নয়, আসলে কোন্ কৌশলে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা সেদিন সম্ভব হয়েছিল তা-ই এবার শোন ঃ

যত কৌশল তা ছিল ঐ ঠোঙাটার ভেতরে। দেখতে সাধারণভাবে খবরের কাগজ মুড়িয়ে বানানো গ্লাসটা পুরোপুরি ঢাকা যায় এমন মাপের ঠোঙা বলে মনে হলেও এর ভেতরে সুতো দিয়ে এমনভাবে এক ডেলা 'হাইপো' ঝোলানো ছিল, যাতে ঢাকা দিলেই এই সুতোয় ঝোলানো 'হাইপো' কফির মধ্যে ডুবে যায়। কফি বলে গ্লাসে যা রাখা ছিল, তাও কফি নয়। খানিকটা টিঞ্চার আয়োডিন জলে গুলে বানানো হয়েছিল এই কফির মত দেখতে জিনিসটা। আয়োডিন-গোলা জলে হাইপো মিশতেই শুরু হয় রাসায়নিক ক্রিয়া আর সঙ্গে সঙ্গে আয়োডিন রং হারিয়ে ফেলে। নাড়ানো, দোলানোতে এই বিক্রিয়া আরো সহজ হয়ে পড়ে।

আয়োডিন ডাক্তারখানায় পাবে, হাইপো পাবে ফটোগ্রাফারদের দোকানে, মিছরির মতো দানাদার। এ সব যেন কোনভাবে মুখে না যায়। বিষাক্ত কিন্তু। খুব সাবধান।

ম্যাজিক ভিলা, 12/6 সেলিমপুর রোড, কলি-31

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসায় জানুয়ারী 83 সংখ্যার দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা— সুপর্ণা সরকার, প্রণবকুমার সরকার, মলয় দাশ, তন্দ্রা দাশ, সবিতা ব্যানার্জী, সান্ত্বনা ব্যানার্জী, সুকমল কুমার দাস, ভোলানাথ দলুই, ইন্দ্রনীল ঘোষ, ভানু অধিকারী, কানাই বসাক, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অরূপ দে, সঞ্জয় পণ্ডিত, বিকাশ মিত্র, অনুপম ভট্টাচার্য.বুনু চ্যাটার্জী, উজ্জ্বল চ্যাটার্জী, শুভাশীষ আতর্থী, ইন্দ্রানীল ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ পাত্র।

24-পরগনা—গৌতমকুমার শাসমল, রূপককুমার নস্কর, অভিজিৎ সাহা, সমীরণ বিশ্বাস, সুমিতা মজুমদার, বিনয় ভট্টাচার্য, দীপক চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, শুভেন্দু দাস, সমর দাস. সৌমেন কর, সন্দীপ কর।

হাওড়া—পার্থসারথি দাঁ, সৌমেন পাল. সৌমেন্দ্রনারায়ণ সরকার, গৌতমকুমার পাণ্ডা, পল্লব চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, শ্রীকুমার মণ্ডল, অর্দ্ধেন্দু পাল।

হুগলী—বনশ্রী মণ্ডল. অমিতাব্রত রায়, অভিজিৎ রায়, সুব্রত দত্ত, সুনীতা ব্যানার্জী, প্রত্যুষ চ্যাটার্জী, নীলমণি দাস, অপর্ণা ভট্টাচার্য, সুপ্তিশ্রী মণ্ডল, সঞ্জয় দাস, রাজকুমার মুখার্জী, প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, বিদ্যুৎবিকাশ ভট্টাচার্য, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু মুখার্জী।

বর্ধমান—অরিজিৎ দাস, সেখ সামসুদ্দিন, মল্লিকা গুহ, দিব্যেন্দু গুহ, গণেশ সাধুখাঁ, গৌতম সাহা, সুজাতা সাহা, প্রদীপ মুখার্জী, সব্যসাচী রায়, শৌভিক সেনগুপ্ত।

মেদিনীপুর—কঙ্কনকুমার পানি, রঞ্জনকুমার পানি, চন্দনকুমার পানি, প্রদীপকুমার গোস্বামী, নিমাইপদ পাল, তরুণকুমার হাতি, দেবাশিষ বিশ্বাস, রুমা মাইতি, শিশির রঞ্জন পাল, আশিস পট্টনায়ক, অনন্ত ব্যানার্জী, রঞ্জনকুমার শাসমল, অরুণাভ সোম, অমিতাভ সোম, সংঘমিত্রা সোম, দেবজ্যোতি ষড়ঙ্গী, ছন্দা ষড়ঙ্গী, মলয় রায়, সুজাতা রায়, বিকাশচন্দ্র বিশ্বাস, বিপুলকুমার কির্ত্তুনীয়া, তুষারকান্তি পাল, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, দেবাশিস মণ্ডল, প্রসিতকুমার সরকার, নীতা বিষ্ণু, অণিমা প্রধান, চিন্ময় সিংহ।

দঃ ত্রিপুরা উদয়পুর—অরবিন্দ চক্রবর্তী, গৌতম নন্দী, শান্তনু সাহা।

নদীয়া—মানস কুণ্ডু, বিশ্বদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়. পারমিতা রায়, দেবাশীষ কুণ্ডু, হিমাদ্রিআদিত্য চৌধুরী, দেবু মণ্ডল, আর. ডি ঘোষ, আশিস বিশ্বাস, সুদীপ্ত বিশ্বাস, সুশীলকুমার কবিরাজ, সুশান্তকুমার কবিরাজ, প্রশান্তকুমার কবিরাজ।

মুর্শিদাবাদ—চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ সাহা, দুলালপদ সাহা, বিবেকানন্দ সরকার, অরুণকুমার দে, প্রেমলতা ছাজেড়, সুশীলকুমার ছাজেড়, গোলাম মর্যুজা, তাপসী মাইতি, দেবপ্রসাদ মাইতি, কাজি জানে আলম, পারভেজ জামান, শামসাদ নাজনীন, মুক্তিপদ দাস।

বীরভূম—শম্পা সিন্‌হা, চন্দন সিন্‌হা, দীপনারায়ণ দত্ত, জীবন নাগ।

বাঁকুড়া—পার্বতী চ্যাটার্জী, প্রদীপ চ্যাটার্জী, উমা চ্যাটার্জী, ধর্মরাজ অধিকারী, সুরজিৎ পাণ্ডা, তরুণ মহাপাত্র।

পশ্চিম দিনাজপুর—শ্রীজ্ঞান মুখোপাধ্যায়।

মালদহ—তাপস চক্রবর্তী, আশীষ চক্রবর্তী, সন্দীপ চক্রবর্তী, দেবব্রত রায়, সরিৎকুমার দাস।

জলপাইগুড়ি—জয়জিৎ লাহিড়ী, অম্বা রায়।

পুরুলিয়া—অঞ্জন ঘোষ, সঞ্জয় ঘোষ, ভৈরব পাল, পবিত্র পাল।

বিহার, জামসেদপুর—প্রেমাশীষ বোস, দেবাশীষ বোস।

জানুয়ারী, 1983 সংখ্যার বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তর

1, অসীম, 2, হাইড্রা, স্পঞ্জ প্রভৃতি বহুকোষী জলজ প্রাণীর দেহে। 3, নীল 4, ক্যাফেইন 5, থাইরক্সিন 6, সিকাডা 7, বায়োটিন 8, জোনাস সল্ক 9. অস্থায়ী খর জলকে 10, $NaNO_3$ 11, সোডিয়াম সিলিকেট 12, ভোল্ট এককে 14, শব্দতরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক বড় 15, গ্যাসের অণুগুলির সর্বদিকে ইতস্তত গতির জন্যে 16, আসামের 'কালিমা' প্রজাপতি।

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ—গরু কিংবা মোষকে ইঞ্জেকসান দিলে কিছু ক্ষণের মধ্যে দুধ দেয় কেন? এই দুধ কি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক? সুজিত বিশ্বাস, রাঁচি, বিহার।

উঃ—গাভীন গরু বা মোষের শরীরে যদি পিটুইটারি গ্রন্থির অন্তঃস্রাবী রস 'পিটুইট্রিন' ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, তা হলে স্তনের দুগ্ধবাহী নলগুলির মাংসপেশী অস্বাভাবিকভাবে সংকুচিত হতে থাকে। ফলে স্তন থেকে যে দুধ নিঃসৃত হয় তা দোহন করে বার করে নেওয়া যায়। অস্বাভাবিকভাবে দুধ বার করে নিলে সে দুধ উপযুক্ত পরিমাণে উপাদান আহরণ করতে পারে না। সুতরাং সে দুধের পুষ্টি কম হবারই সম্ভাবনা! এ ছাড়া আর কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

প্রঃ—এক টুকরা কঠিন পদার্থের নমুনা থেকে কি করে বুঝব যে, সেটা জীবের অংশ অথবা জড়ের অংশ?

সমীর দালাল, অভিরামপুর, বর্ধমান।

উঃ—নমুনাটি যদি জীবের অংশ হয়, তা হলে স্বাভাবিক অবস্থায় কিছু দিন পরে তাতে পচন ধরবে। জড়ের অংশ হলে তা হবে না। দ্বিতীয়ত, জীবের অংশ হলে বিশ্লেষণ করে তাতে কোষের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু জড় পদার্থের অংশে কোষের কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না।

প্রঃ—হাই ওঠে কেন?

পার্থপ্রতিম তরফদার, খাল বোয়ালিয়া, নদীয়া। দেব জ্যোতি ষড়ঙ্গী, কাঁথি, মেদিনীপুর।

উঃ—হাই ওঠা অনৈচ্ছিকভাবে প্রশ্বাস নেওয়ার একটি প্রকরণ মাত্র। হাই ওঠার প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করে বলা যায় না। হাই ওঠার সময় মুখমণ্ডলের কয়েকটি মাংশপেশী সংকুচিত এবং বিস্ফারিত হয়। ঘুম পাবার আগে এবং ঘুম থেকে ওঠার পর সাধারণত বেশি হাই ওঠে। এ ছাড়া বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে অনেকের হাই ওঠে! সামনে কোনো লোক হাই তুললে অন্যেরও সেই সময় হাই ওঠে। হয়তো পূর্ব স্মৃতির প্রতিবর্ত।

প্রঃ—বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে খরা চলছে। আগে নদীর ধারে, মাঠে, রাস্তার ধারে যেসব বড় বড় গাছপালা ছিল, নানা প্রয়োজনে মানুষ সেসব কেটে ফেলার দুরনই কি খরা দেখা দিয়েছে?

নারায়ণ সরকার, কেশবপুর, হুগলী।

উঃ—বৃষ্টির জন্যে গাছপালার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সে কথা মনে না রেখে নির্বিচারে গাছপালা কেটে ফেলা খরার অন্যতম কারণ নিশ্চয়। সে কারণে এখন বৃক্ষ রোপণের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

1. মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় কান, কয়টি ভাগে বিভক্ত?

2. মধ্যকর্ণ কয়টি ক্ষুদ্রাস্থি (Ossicle) দ্বারা গঠিত?

3. অন্তঃকর্ণের প্রধান অংশটির নাম কি?

4. N. A. S. এর অর্থ কি?

5. প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় এক মিলিলিটার হাইড্রোজেন পার অক্সাইডকে উত্তপ্ত করলে যদি কুড়ি মিলিলিটার অক্সিজেন ইৎপন্ন হয়, তবে ঐ হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দ্রবণের শক্তি বা Strength কত?

6. নীল (Indigo) কে ওজোন (Ozone) গ্যাসের সংস্পর্শে নিয়ে এলে কি হবে?

7. কোন্ বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত করেন?

8. যে প্রক্রিয়ায় শোষিত পদার্থ শোষক পদার্থের কেবল পৃষ্ঠতলে ঘনীভূত হয়, সেই প্রক্রিয়ার নাম কি।

9. কোন বস্তুতে 1°C উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপ লাগে তাকে কি বলে?

10. যে উষ্ণতায় দ্রাব ও দ্রাবক পৃথক না হয়ে সমস্ত দ্রবণ জমাট বেঁধে যায়, সেই উষ্ণতাকে কি বলে!

11. বায়ুশূন্য স্থানে কোন্‌টি বেশী ভারী—এক পাউণ্ড তুলা, না এক পাউণ্ড লোহা?

12. আবহাওয়া বিজ্ঞানে 10^6 dynes/sq. cm. কে কি বলা হয়?

13. একটি বস্তুর বায়ুতে ওজন 35 গ্রাম, কিন্তু জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় সেই বস্তুর ওজন 28 গ্রাম বস্তুটির ঘনত্ব কত?

14. সুষম গোলকের ভারকেন্দ্র (Centre of gravity) কোথায় অবস্থিত থাকে?

15. 'ভার্নিয়ার স্কেল' কে আবিস্কার করেন?

16. হীরক থেকে বায়ুতে আলোকের প্রতিসরণের 'সঙ্কট কোণ' কত?

—o—

(সমাধান পরবর্তী সংখ্যায়)

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত 'প্রিয় বিজ্ঞানী' রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র

অজিত দেবনাথ

যে কয়জন প্রতিভাধর মনীষী বিশ্বসভায় ভারতকে বিশিষ্ট স্থান দান করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু অন্যতম। তিনি 1858 খ্রীঃ 30 নভেম্বর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাঢ়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু অতিশয় তেজস্বী ও শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বালক জগদীশের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। শহরে তখন দুটি বিদ্যালয় ছিল—একটি ইংরেজি বিদ্যালয়, অন্যটি বাংলা বিদ্যালয়। ভগবানবাবু তাঁর পুত্রকে বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, দেশের সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের বালকদের সঙ্গে নিজের মাতৃ ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করলে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সহজ এবং স্বাভাবিক হয়। বাল্যের এই শিক্ষার গুণেই জগদীশচন্দ্রের সমগ্র জীবনে তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও দেশাত্মবোধ নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা বিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে জগদীশ কলিকাতা হেয়ার স্কুল ও পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। শেষোক্ত বিদ্যালয় থেকেই তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় পাস করে সেখানকার কলেজ বিভাগে উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ করেন। কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাফঁ জগদীশচন্দ্রের ছাত্রজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই ফাদারের কাছেই জগদীশচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়। ঐ কলেজ থেকে বি. এ পাস করে উচ্চ শিক্ষার জন্যে লণ্ডনে যান। সেখানকার কেম্ব্রিজ ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। কলেজে বিজ্ঞানের অনেক বিখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়। লর্ড র‍্যালের কাছে তিনি পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রাণীবিজ্ঞানে মাইকেল ফস্টার, ফ্রান্সিস ব্যালফোর প্রভৃতি তাঁর শিক্ষক ছিলেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভিনে ও ফ্রান্সিস ডারউইন-এর কাছে তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান শিক্ষা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস, সি, ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। বিদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেন। কবির কাব্য যেমন কবির জীবন থেকে অভিন্ন, বিজ্ঞান তেমনি জগদীশচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সংযুক্ত। বিজ্ঞানের গবেষণা কাকে বলে, ভারত-বাসী যখন তা কিছুই জানত না, সেই সমস্ত নানা প্রতিকূল অবস্থায় তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধান করেছিলেন। অনেক নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করে জগতের জ্ঞান-সম্পদ বর্ধিত করেছিলেন।

উদ্ভিদ ও প্রাণী-বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার মূল্য নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। তবে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, যে সব যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর গবেষণা করেছিলেন, তার শিল্পকুশলতা ও পরিকল্পনা অসাধারণ। গাছের ক্রম-বৃদ্ধি, উদ্ভিদ জগতের চেতনার সাড়া তাঁর যন্ত্রগুলিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নির্ভুলভাবে ধরা পড়েছে। অধ্যাপক ডবলিউ এইচ ব্র্যাগ, অধ্যাপক এফ ডবলিউ অলিভার, লর্ড র‍্যালে, অধ্যাপক বেলিস, অধ্যাপক এফ জি ডোনান প্রভৃতি নাম-করা বিজ্ঞানীরা এই সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, জগদীশচন্দ্রের 'ক্রেস্কোগ্রাফ' যন্ত্রের বিবর্ধন 10 লক্ষ থেকে 1 কোটি। এর অর্থ এই যে, গাছ বাস্তবিক যতটুকু বাড়ে তার 10 লক্ষ থেকে 1 কোটি গুণ বড় করে এই যন্ত্রে দেখানো যায়। জগদীশচন্দ্র তাঁর সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে লজ্জাবতী লতা এবং আরো অনেক উদ্ভিদের চেতনারাজ্যের অনেক তথ্য ও তত্ত্ব জানতে পেরেছিলেন। "নার্ভাস সিস্টেম ইন প্ল্যাণ্টস", "ফেনোমেনন অব ইরিটেবিলিটি ইন প্ল্যাণ্টস" প্রভৃতি সম্বন্ধে জগদীশ-চন্দ্রের বহু শ্রমসাপেক্ষ গবেষণা তাঁর প্রণীত পুস্তকাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে।

1937 সালের 23 নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 79 বছর।

চরমাজদিয়া, চরব্রহ্মনগর, জেলা নদীয়া

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত 'প্রিয় বিজ্ঞানী রচনা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

মেঘনাদ সাহা

তপন ঘোষ

1893 খ্রীষ্টাব্দের 16 অক্টোবর ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায় সেওড়াতলী গ্রামে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা।

মেঘনাদের পড়াশোনার আগ্রহ দেখে পিতা জগন্নাথ সাহা প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, পরে ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। 1911 খ্রীষ্টাব্দে আই, এস-সি পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে অঙ্কে অনার্স সহ বি, এস-সি কোর্সে অধ্যয়ন করতে থাকেন। এই পরীক্ষাতেও তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। 1915 খ্রীষ্টাব্দে ফলিত গণিতে এম, এস-সি পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করেন।

এরপর বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। এর সঙ্গে তাঁর গবেষণাও আরম্ভ হয়েছিল। আপেক্ষিকতাবাদ, তড়িৎ ও আলোক সম্বন্ধে তিনি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন। এরই উপর তিনি ডি, এস-সি ডিগ্রি পান। এরপর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কিছুকাল তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

1919 খ্রীষ্টাব্দে ডঃ সাহা তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব 'থিয়োরী অব থারমাল আয়োনাইজেশন বা তাপ আয়নন তত্ত্বের জন্য বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজে খ্যাতি লাভ করেন।

দু বছরের বেশি সময় তিনি লণ্ডনে ও বার্লিনে গবেষণা করেন।

ভারতে পারমাণবিক গবেষণার মূলেও ডঃ সাহার অবদান অনেক। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন এর মূল উৎস। তাঁরই উদ্যমে কলিকাতায় 'ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' (বর্তমানে সাহা ইনস্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স) প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি পৃথিবীর বহু জায়গায় গিয়েছিলেন। 1947 খ্রীষ্টাব্দে নিউটনের ত্রিশত বার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে লণ্ডনের 'রয়্যাল সোসাইটি' কর্তৃক আমন্ত্রিত হন।

ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে 1949 খ্রীষ্টাব্দে 'বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' নামে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। তিনি ছিলেন ওই কমিশনের অন্যতম সদস্য। ডঃ সাহার গভীর জ্ঞান, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা পরিকল্পনা, ইত্যাদি বিষয়ে দূরদৃষ্টি বিজ্ঞানীদের মুগ্ধ করে। একাধারে এত বিষয়ে পাণ্ডিত্য ইদানীং (পশ্চিমবঙ্গে) খুব কম মনীষীর মধ্যেই দেখা গেছে। ভারতে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনার জন্যে কোনো পত্রিকা ছিল না। তিনিই 1935 খ্রীষ্টাব্দে 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

বিশাল ভারতবর্ষে অপরিমিত দারিদ্র্য কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে উদাসীনতা, দেশের প্রগতি আলোচনা ডঃ সাহার রচনায় দেখা যায়।

1956 খ্রীষ্টাব্দের 16 ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজার দিনে এই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীর হঠাৎ জীবনাবসান ঘটে।

বি. ই কলেজ মডেল স্কুল, হাওড়া-3

স্বয়ংচালিত গাড়ি

জ্যোতিষ সরকার

একটি নতুন খেলনা মডেলের তৈরী করার কথা বলছি। যদিও এটি ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ, তবে তৈরী করলে চমৎকার হবে। মডেলটি হলো একটি জীপ গাড়ির। তৈরী করার প্রধান দুটি পর্যায় থাকবে। প্রথম হলো গাড়ির কাঠামো বানানো, দ্বিতীয় ইলেক্ট্রিক্যাল যন্ত্র সেট করা। যথেষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা আবশ্যক।

যে সকল জিনিসগুলো দরকার প্রথমে সেগুলির উল্লেখ করছি। (1) চারটি হালকা কাঠের চাকা, ব্যাস হবে প্রায় দু'ইঞ্চি। কোনো ছুতোর মিস্ত্রিকে দিয়ে চাকাগুলো তৈরী করে নাও। (২) কতগুলি হালকা ও সরু কাঠের ফ্রেম (ছোট-বড়ো মিলিয়ে প্রায় 25-26 টি) (3) হালকা কাঠবোর্ড কিংবা প্লাইউড (4) একটি ইলেক্ট্রিক মোটর —কম শক্তির, সাধারণতঃ গ্রামোফন রেকর্ড ঘোরাবার জন্যে যেগুলো ব্যবহৃত হয়। (5) ছোট অথচ হাই পাওয়ারের ব্যাটারী কয়েকটি। মোটামুটি 7 ভোল্ট হলেই চলবে। (6) তামার তার (7) 2 সেমি ও 1 সেমি সাইজের কিছু পেরেক (8) বিভিন্ন রং।

এখন 2 নং ছবিটা লক্ষ্য কর। পাশের এবং জানলার ফ্রেমগুলি মাপ অনুযায়ী পেরেকের সাহয্যে সেট কর। এবারে সম্পূর্ণ কাঠামোর উপরে কাঠবোর্ড বা প্লাইউড দিয়ে ছোট পেরেক দিয়ে আটকিয়ে দাও। (জানালায় সামনের) স্বচ্ছ প্লাষ্টিক আঠা দিয়ে বসিয়ে দেবে।

পরবর্তী অংশটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যে 'ইলেকক্ট্রিক মোটরটার' কথা বলেছি, সেটার দুধার দিয়ে একটা লোহার সরু অক্ষরেখা বের করা থাকে, ইলেক্ট্রিক সংযোগে এই অক্ষ দুটি ঘুরতে থাকে। পেছনের চাকা যেখানে বসবে ঠিক তার মধ্যিখানে এই মোটরটা বসাও। এখন চাকা দুটির কেন্দ্রের সঙ্গে অক্ষ দুটি এক সরলরেখায় সেট করে দাও যেন মোটরের অক্ষের ঘূর্ণনের ফলে চাকা দুটিও স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারে। বুঝতে অসুবিধা হলে ছবিটা (1 নং ও 4 নং) মিলিয়ে দেখে নাও।

সামনের চাকা দুটো একটি অক্ষে লাগিয়ে বসিয়ে দিও। কারণ ওখানে কোনো যন্ত্রাংশের প্রয়োজন নেই। তবে মোটরটিকে ঘোরাবার জন্যে ইলেক্ট্রিসিটি দরকার। তার জন্যে ব্যবহার করতে হবে 7-8 ভোল্টের একটি ব্যাটারী বক্স। বক্সটি সেট করবে নীচের প্লেটের ওপর। মোটর ও ব্যাটারীর সংযোগের একটি তার খোলা রাখবে এবং এই খোলা মুখ দুটি বাইরে সামান্য বের করে দেবে, যেন যোগাযোগ করে দিলেই ইলেকক্ট্রিসিটি চলাচল করে মোটরটিকে ঘোরাতে পারে।

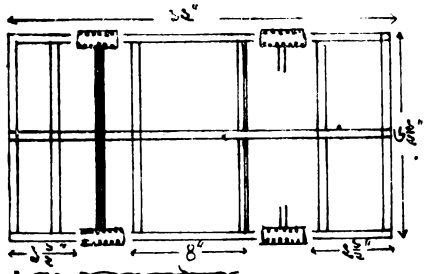

১নং-তলার কাঠামো-

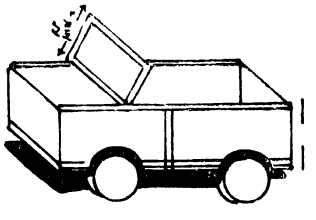

২নং-পাশের কাঠামো-

তৈরীর পর্যায়ক্রম ঃ 1 নং ছবিটা ভালোভাবে দেখ, ওতে সমস্ত মাপ দেওয়া আছে। কেমন করে সেট করবে তাও বুঝতে পারবে। প্রথমে কাঠের ফ্রেমগুলোর সাহায্যে মডেলের নিচের কাঠামোটি তৈরী কর (2 সেমি, পেরেক দিয়ে আটকাবে)। চাকা লাগানোর অংশটা আপাততঃ ফাঁকা রেখে দাও।

একটা কথা বলি, এটা সব সময় মনে রাখতে হবে সম্পূর্ণ মডেলটার ওজন যাতে বেশ হালকা হয়, এজন্যে সুইচ (মোটর ঘোরানোর জন্যে) কিংবা বড়ো সাইজের ব্যাটারী ব্যবহার করা যাবে না। গাড়ির গতিবেগ যদি বেশি করতে চাও, তবে সেই অনুসারে ভোল্টেজও বেশি দিতে হবে। অর্থাৎ বেশী সংখ্যায় ব্যাটারী লাগাতে হবে।

৩ নং- কাঠবোর্ড আটকানোর পর—

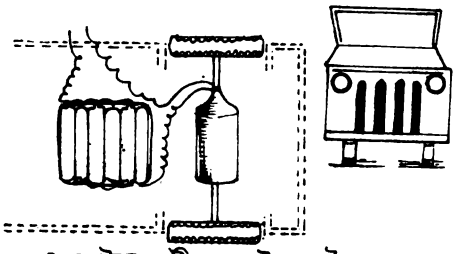

৪ নং- ইলেকট্রিক মোটর সেট করা—

৫ নং- পূর্ণ আকৃতি।

গাড়িটিকে এবার প্রয়োজনমতো রঙ কর। সামনে দুটো টর্চের বাল্ব (ফিউজ হলেও চলবে) দিয়ে গাড়ির ফোকাসিং আলো বানাও। ইচ্ছে করলে সীট তৈরী করে তাতে একটা হালকা পুতুলও বসিয়ে দিতে পার।

এবার সম্পূর্ণ মডেলটি তৈরী হয়ে গেল। সমান জায়গায় দাঁড় করিয়ে তার দুটো ল্যাগয়ে দিলেই দেখবে গাড়ি সামনের দিকে ছুটে চলছে। খুলে দিলেই আবার গতিবেগ মন্থর হয়ে থেমে যাবে!

দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান), খড়িবাড়ী হাইস্কুল
পোঃ খড়িবাড়ী, জেঃ দার্জিলিং

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত 'প্রিয় বিজ্ঞানী' রচনা প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

সৌম্য চট্টোপাধ্যায়

1922 সাল। ভীষণ বন্যায় উত্তর বঙ্গ ভেসে গেল। লোকে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। কত লোক মরে গেল। কত গরু-বাছুর গেল ভেসে। কে ঐ ক্ষীণকায় মানুষটি অতি সাদাসিধে পোশাকে দিনরাত লোকের সেবা করে চলেছেন? যাদের অসুখ করেছে সেখানে ওষুধ নিয়ে, যারা খেতে পাচ্ছে না সেখানে খাদ্য নিয়ে, যাদের পরণে কাপড় নেই সেখানে কাপড় নিয়ে হেঁটে চলেছেন? ইনিই আমার প্রিয় বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

1861 খ্রীষ্টাব্দের 2 আগষ্ট খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরিশচন্দ্র রায়। তিনি গ্রামের পাঠশালায়, কলকাতার হেয়ার স্কুলে, অ্যালবার্ট স্কুলে, ও মেট্রোপলিটন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। এখানকার কলেজে পড়া শেষ হলে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানকার এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস. সি. ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর সহকর্মী। 1895 খ্রীষ্টাব্দে তিনি "মারকিউরাস্ নাইট্রাইট্" আবিষ্কার করেন। সুপ্ত হিন্দু রসায়নকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। বাংলাদেশে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের জন্যও তিনি চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত "বেঙ্গল কেমিক্যাল" বর্তমানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওষুধের কারখানা। এই সময়ে তিনি "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" রচনা করেন। এই বইখানিতে তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চায় প্রাচীন ভারতবর্ষ কত উন্নত ছিল।

তিনি শুধু বিজ্ঞানীই ছিলেন না, ছিলেন ছাত্রদরদী, শিক্ষাব্রতী, দেশপ্রেমিক ও স্বজাতিবৎসল। দেশী-কাপড় ছাড়া অন্য পোশাক পরতেন না, খাওয়া-দাওয়া সেই পুরাতন নারিকেল মুড়ি! তিনি দেশ ও দেশবাসীকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। ধর্মে, কর্মে, শিল্পে, বাণিজ্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে এক-কথায় সভ্যতার সকল ক্ষেত্রে-বাঙালীই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করুক—এটাই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা। তাঁর সরল ও অমায়িক ব্যবহারে ছাত্ররা তাঁকে পিতার মত শ্রদ্ধা করত। তিনি ছাত্রদের দেখিয়ে বলতেন: 'লোকে অনেক ধন-দৌলত রেখে যায়, কিন্তু আমার কোন ধন-দৌলত নেই। এরাই আমার ধন-দৌলত। এদের আমি রেখে যাচ্ছি।' তাঁরই হাতে গড়া মেঘনাদ সাহা, নীলরতন ধর, সত্যেন বসু, জ্ঞান ঘোষ প্রমুখ ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা।

দেশদরদী এই জ্ঞানতপস্বী 1944 খ্রীষ্টাব্দে 16 জুন মহাপ্রয়াণ করেন।

বালিগঞ্জ সরকারী বিদ্যালয়, কলি—19

শিশুর কল্যাণ
নারীর সম্মান
দেশের উত্থান

চারা গাছ একদিন হয়ে ওঠে উপবন
আজকের শৈশব কালকের যৌবন।
শিশুই দেশের কর্ণধার
এর কাঁধে রয়েছে ভবিষ্যতের ভার।

নতুন বিশ দফা কর্মসূচীতে শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য সুসংহত শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মা শুধু যে শিশুর জননী তাই নয়, তার প্রথম শিক্ষাদাত্রীও বটে। তাঁরাই দেশকে সত্যিকারের গড়ে তোলেন। নারী ও শিশুর কল্যাণের ওপরেই নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি।

তাই শিশু কল্যাণ ও নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই কার্যসূচীকে নতুন জীবন দেওয়া হচ্ছে।

বালকের পুষ্টি আহার
যখন হয় সীমিত পরিবার।

বিস্তৃতভাবে জানতে হলে নিম্নলিখিত এই কূপন ব্যবহার করুন।

শ্রী ডি এল ঘোষাল
অ্যাসিস্টেণ্ট ডিস্ট্রিবিউশান ম্যানেজার,
রিজানাল ডিস্ট্রিবিউশান সেণ্টার
ডি. এ. ভি. পি.
৩৯, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা–৭০০০৭৩

আমি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী। অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা/ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম.....

ঠিকানা.....

.....পিন.....

নতুন 20 দফা কর্মসূচী

davp 82/418

হারুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

টেবেস প্রণালীর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য দ্বীপ এবং শিলাখণ্ড। এখান দিয়ে জাহাজ চালনো দুঃসাধ্য ব্যাপার। নটিলাসের গতি তাই অনেক কমিয়ে দেওয়া হল প্ল্যাটফর্মে প্রফেসর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে উঠে এলেন।

হঠাৎ জাহাজটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল..
নটিলাসের সাথে ডুবোপাহাড়ের সংঘর্ষ হয়েছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নটিলাস। যে জায়গায় ডুবোজাহাজটা আটকেছে সেখানে জলের স্রোত অল্প তাই নটিলাসকে ঠিক মত ভাসানো গেলনা।

উপরে উঠে এলেন নিমো।
নটিলাসের কি কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে?
দুর্ঘটনা নয়, ঘটনা মাত্র।
আজ চার তারিখ। আর পাঁচ দিন পরে আকাশে উঠবে পূর্ণ চন্দ্র। তার আকর্ষণে উদ্ভূত জোয়ার ফিরিয়ে দেবে নটিলাসের গতি।

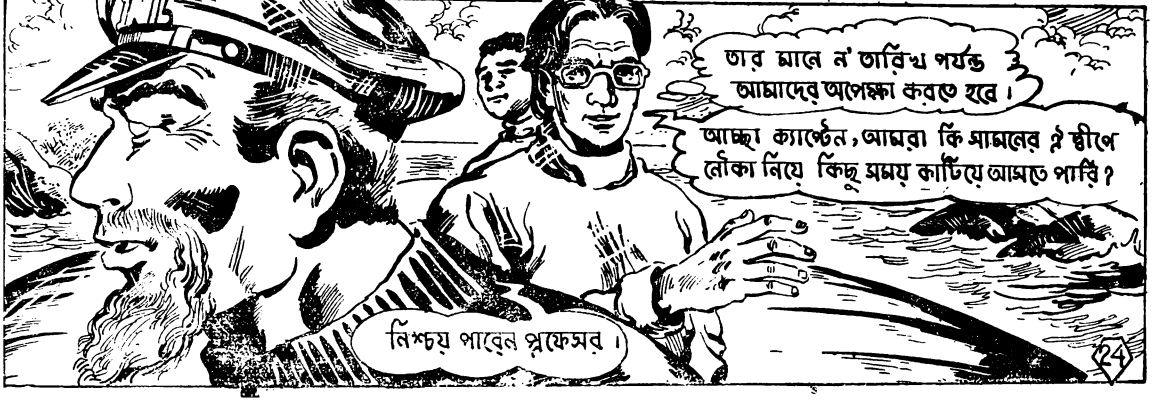
তার মানে ন' তারিখ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।
আচ্ছা ক্যাপ্টেন, আমরা কি আমাদের এই দ্বীপে নৌকা নিয়ে কিছু সময় কাটিয়ে আসতে পারি?
নিশ্চয় পারেন প্রফেসর।

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 2nd year • Feb. 1983 Regd No WBCC/50

উপহার ও পাঠাগারের বই

কিশোর ক্ল্যাসিক্‌স

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর
- ভেপান্তর ১৫-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ছোটদের কাশীনাথ ৬-০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- কিশোর অপু ১৫-০০
- অপুর ছেলেবেলা ৬-০০
- ছোটদের অপরাজিত ৬-০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
- ছোটদের কাজল ৬-০০

বুদ্ধদেব বসু
- অপরূপ রূপকথা ১০-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত
- বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ১০-০০
- মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ৮-০০
- আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪-০০
- বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ৪-০০
- পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা ৪-০০

সমরজিৎ কর
- নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত
- আলো আরও আলো ১৫-০০
- রোমাঞ্চকর রসায়ন ১২-০০

নতুন বই ! ছবির বই !! খেলার বই

সিদ্ধার্থ ঘোষ

অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ৮·০০

বাক্সের মধ্যে বই ও এক বাক্স খেলার সরঞ্জাম

ছবি ও ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
- খুকুমনির ছড়া ১০-০০
- রাঙা ছবি ৩-৫০

অন্নদাশঙ্কর রায়
- হট্টমালার দেশে ৫-০০

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- ঘনাদার জুড়ি নেই ৫-০০
- মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৫-০০
- ঘনাদা বিচিত্রা ১২-০০

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়
- টেনিদার অভিযান ১৫-০০
- চারমূর্তি ৫-০০
- ঝাউবাংলোর রহস্য ৫-০০
- কম্বল নিরুদ্দেশ ৫-০০

ফ্যান্টাসী, রহস্য ও অভিযান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- সুন্দরবনে সাত বৎসর ৫-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- হাতিচোর ৬-০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা ১০-০০
- রামধনু ৬-০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
- কায়াহীনের কবলে ৪-০০
- হট যাও হার্মাদ ৫-০০

ধীরেন্দ্রনাথ ধর
- দুরন্ত যাত্রী ৫-০০

কোনান ডয়েল
- শার্লক হোমসের কিশোর গোয়েন্দা গল্প ৭-০০
- শার্লক হোমসের কিশোর রহস্য গল্প ৭-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা–৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রচ্ছদমুদ্রণ : রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২